ইসলাম আরবদের জাতীয় আন্দোলন

আনোয়ার শেখ

আনোয়ার শেখ

সূচী

ভূমিকা

যারা আরব নয় এমন মুসলিমদের জাতীয় মর্য্যাদার এতো বেশী ক্ষতি করেছে ইসলাম, যতো ক্ষতি আর কোনো বিপর্য্যয় থেকে এপর্যন্ত হয়নি। তবু তারা বিশ্বাস করে যে এই ধর্মই ১। সাম্য এবং ২। মানুষের ভালবাসার বাণী প্রচার করে থাকে।

১ক। এই ধারণা সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং অত্যন্ত সুকৌশলে একে সত্য বলে প্রচারিত করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে পয়গম্বর মহম্মদ মানবসমাজকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—আরব এবং যারা আরব নয়। এই শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী আরবরা শাসক এবং যারা আরব নয় তারা আরব সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা শাসিত হবে। ইসলাম এই স্বপ্নকে রূপায়িত করেছে কারণ এর মূল তত্ত্বগুলি আরবদের শ্রেষ্ঠত্বকে আকাশচুম্বী করেছে এবং সাথে সাথে যারা আরব নয় তাদের জাতীয় মর্য্যাদাকে হীনমন্যতার শিকার করেছে। আরবদের পক্ষে এই পরিকল্পনা চমৎকার, বিস্ময়জনক ও রহস্যময়, কিন্তু যারা আরব নয় এমন মুসলিমদের পক্ষে এটি দুর্বলতাব্যঞ্জক, উপহাসমূলক এবং ধ্বংসাত্মক। তবুও এর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবে তারা নিজেদের হীনমন্যতাকেও সোৎসাহে বরণ করে, আশা করে পুরস্কার স্বরূপ পয়গম্বর তাদের স্বর্গীয় সুখ প্রদান করবেন।

২খ। ইসলামের মানবপ্রেম, আরো বড় ছলনা। অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ইসলামের অস্তিত্বের মর্ম কেন্দ্র। ইসলাম তার বিরোধীদের জন্য নরকবাসের বিধান দেয় এবং মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে ক্রমাগত অসন্তোষ ও বিভেদের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে চায়। ইসলাম কার্ল মার্কসের সামাজিক সংঘর্ষের মতবাদের থেকেও মারাত্মক।

আরব জাতির জয়গানের প্রবণতা জনিত কারণে ইসলাকে ধর্ম না বলে আরবদের জাতীয় আন্দোলন বলাই উচিত। যারা আরব নয় তাদের মগজ 'ধোলাই করার মধ্যেই এর সাফল্য। তখন তারা তাদের নিজেদের জাতীয় পরিচয়ের জন্য লজ্জা বোধ করে এবং আরবদের পবিত্রতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও আধিপত্যের প্রতি তাদের অনুরাগ প্রকাশ করে। এই মনোভাবের কারণ পয়গম্বর মহম্মদের মধ্যস্থতা করার কাল্পনিক অলৌকিক

ক্ষমতায় তাদের বিশ্বাস। এই মানসিক জড়তা, বড় বড় এশিয় জাতিগুলির, যথা—ভারত, মিশর, ইরান প্রভৃতির অবক্ষয়ের কারণ। এরা একদিন সভ্যতার উৎসরূপে পরিচিত ছিল কিন্তু আজ তারা তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত। এর কারণ তারা ইসলামের প্রভাবে তাদের জাতীয় পরিচয় ও উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছে।

এই বইটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর লিখিত। দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা এর থেকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ভাবে সুযোগ নেবার চেষ্টা করতে পারে। যদি তারা প্রকৃতই সৎ হয় তবে তারা কোরাণ কথিত বিতর্ক পদ্ধতির কথা মনে রাখবে —

"যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে প্রমাণ উপস্থিত কর।" (সূরা বাকারাহ্ ১১১)

এই বইটি "কালচার ঃ দ্য ডেস্টিনি," বইটির অপ্রকাশিত অংশ। এর ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্বের জন্য আলাদাভাবে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়েছে। পাঠককে বইটির মর্মোদ্ধারে সাহায্য করবার জন্য লেখনশৈলীতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ইচ্ছাকৃত ভাবে।

আনোয়ার শেখ

অনুচ্ছেদ -১

জাতীয়তাবাদ—নবীবাদের মূলসূত্র

সেমিটিক সংস্কৃতি থেকে উদ্ভুত ইসলাম ধর্ম মানুষের আক্রমণাত্মক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। 'নোয়া'র জ্যেষ্ঠপুত্র 'শেম' এর বংশজ মানুষের জীবনচর্যা বা জীবনধারাই সেমিটিক সংস্কৃতি বা সভ্যতা। মূলতঃ "সেমাইট" শব্দটি ব্যাবিলনিয়ান, আসিরিয়ান, অ্যারামিয়ন, ক্যানানাইট এবং ফিনিশিয়ানদের প্রতি প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এখন মুখ্যতঃ ইহুদি এবং আরব এই দুটি প্রধান জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যাদের পূর্বপুরুষ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতিও অভিন্ন। যদিও ধর্মীয় ভেদভাব, পারস্পরিক ঘৃণা এবং ধ্বংসাত্মক ও ক্ষতিকর মনোভাবের পটভূমিকায় এদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ইহুদীদের জাত্যভিমান এবং পার্থিব জগতে অভূতপূর্ব সাফল্য, যুক্তভাবে, জাতিনির্বিশেষে সকলের মনে ঈর্ষ্যার আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল, যার প্রভাবে ইহুদীরা বারবার আহত, আক্রান্ত, এবং বিদ্ধস্ত হয়েছে।

আপাত দৃষ্টিতে স্ববিরোধী হলেও, যা ইহুদী এবং আরবজাতির সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন তাই আবার তাদের জাতিগত বিরোধের ভিত্তি। সেমিটিক জগতের প্রাচীনতম ঐতিহ্য "প্রত্যাদেশ সংক্রান্ত মতবাদ"ই এর কারণ। এর এক নিগূঢ় অর্থ আছে, যা সহজ বোধ্য নয়। এই ধর্মীয় রহস্যোদ্ঘাটন সম্পর্কিত ধারণা সেমিটিক সংস্কৃতির মূল, যাকে কেন্দ্র করে এর জনজীবন আবর্তিত হয়।

প্রত্যাদেশ বা রহস্যোদঘাটনের অর্থ,—এই ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরের সৃষ্ট, যিনি মানুষের পূজা নিতে আগ্রহী। ঈশ্বর তাঁর ইচ্ছাকে মানুষের কাছে ব্যক্ত করেন তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে যাঁকে নবী বা পয়গম্বর বলা হয়, এবং যিনি দৈবী ইচ্ছাকে ব্যক্ত করে থাকেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ ঈশ্বর প্রেরিত দূত, এই নবীকে মান্য না করে,ততক্ষণ তার মুক্তি নেই। যদিও সাধারণতঃ এর অর্থ এই যে প্রতিটি জনপদ, নগর এবং দেশ, যেমন, সুমের, ব্যবিলন ইত্যাদি প্রত্যেকের প্রধান ছিলেন এক একজন দেবতা, স্থানীয় বা জাতীয় পুরোহিত শাসক যাঁর প্রতিনিধিত্ব করতেন। ঈশ্বরই আইন সৃষ্টি করতেন

এবং স্থানীয় শাসকের কাছে তা ব্যক্ত করতেন এবং তাকে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা এবং নৈতিকতা সংক্রান্ত নির্দেশ দিতেন। অর্থাৎ মানুষ কীভাবে কথা বলবে, চলাফেরা করবে, পান, ভোজন, নিদ্রা, জাগরণ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় সুস্পষ্ট নির্দেশিকা দেওয়া হত। অর্থাৎ শাসক হবেন শুধুমাত্র ঈশ্বরের সেবক, যার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা থাকবে না, তিনি শুধুমাত্র দৈবী ইচ্ছাকে কার্য্যকরী করবেন। ইসলামীয় নীতি অনুসারে শাসনতন্ত্র ঈশ্বরের এবং একমাত্র তাঁর ইচ্ছানুসারেই নিয়ন্ত্রিত হবে, এই তত্ত্ব প্রাচীন সেমিটিক ঐতিহ্যেরেই অনুসরণ এবং সংযোজন।

যেহেতু এই ঐতিহ্য সেমিটিক সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক, এর গুরুত্ব বোঝানোর জন্য কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

তৃতীয় শালমানেসের (৮৫৮-৮২৪ খৃঃ পূঃ) এক লিপিতে উৎকীর্ণ করেছেন, কীভাবে তিনি ১২টি রাজার এক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, যারা তাঁকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। প্রতাপশালী আসিরিয় রাজা শালমানেসের, নিজেকে "আসুরের পুরোহিত" বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, "মহারাজা, সমস্ত মহান দেবতাদের রাজা" তাঁকে "মহৎ দৈবী শক্তি" দিয়েছিলেন, যার সাহায্যে কারকারের যুদ্ধে তিনি তাঁর সমস্ত শত্রুসহ "আহাব" নামক ইসরায়েলিয় নায়কের দশসহস্র যোদ্ধাকে বিনাশ করেছিলেন।

আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ মারডুক (Marduk), যিনি ছিলেন ব্যাবিলন নগরীর প্রধান দেবতা এবং ব্যবিলনের জাতীয় দেবতা। তাঁর বিভিন্ন গুণাবলী অনুযায়ী পঞ্চাশটি নাম ছিল। কথিত আছে যে তিনি মানুষ এবং সমগ্র প্রকৃতি সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনিই সকল রাজা এবং প্রজাগণের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন। আসিরিয়া এবং পারস্যের শাসকগণও মারডুককে মান্যতা প্রদর্শন করতেন।

"ইয়া"র পুত্র ছিলেন মারডুক। 'তিয়ামাত' নামে এক দানবকে বধ করে তিনি প্রধান দেবতার স্থান অর্জন করেন। যখন তিনি দানবের চক্ষুভেদ করেন, তখন সেই দানবের চোখের অভ্যন্তর থেকে বিখ্যাত নদীদ্বয় টাইগ্রিস এবং ইউফ্রেটিস এর উৎপত্তি হয়েছিল।

এই প্রধান দেবতার অধীনে এক শ্রেণীর ছোট খাটো দেবতা ছিলেন, যাঁদের ওপরে নানাপ্রকার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। যথা সূর্য্যদেবতা "উতু", দেবতাদের বিচারক ছিলেন এবং ন্যায় নীতি ও নিরপেক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করতেন। ফলে দানবদের বিরুদ্ধে

নালিশ থাকলে, লোকেরা নির্দিষ্ট আদালতে গিয়ে, দুষ্ট আত্মার বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে 'উতু'র কাছে প্রতিকার চাইত। মীমাংসার জন্য আদালতের বিচারপতির কাছে যেত না।

আরেকটি উদাহরণ ঃ — বিখ্যাত ব্যাবিলনীয় আইন সঙ্কলন, যা 'হামুরাবি'র আইন বলে পরিচিত, তা প্রকৃতপক্ষে এই রাজা কর্তৃক গৃহীত আইনানুগ সিদ্ধান্তের সংকলন। এগুলি হামুরাবির রাজত্বকালের শেষ দিকে সংগ্রহ করে, প্রস্তর ফলকে খোদাই করে, ব্যবিলনের মারডুক দেবতার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এইসব মানুষের তৈরী আইনগুলি মারডুক দেবতার প্রত্যাদেশ বলে জনসমক্ষে ঘোষণা করা হয়েছিল। স্থানীয় দেবতার কাছ থেকে সরাসরি প্রত্যাদেশ গ্রহণরত অবস্থায় হামুরাবি'র বিভিন্ন মূর্ত্তির মাধ্যমে এই তথ্য বিধৃত করা হয়েছে।

সেমিটিক রাজন্যবর্গের ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব করার এই প্রথা খুব দক্ষতার সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে। প্রথমতঃ দেবতাকে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা এবং গুণের অধিকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ ভয়ে বশীভূত হয়। দেবতা মেরোডাক বা মারডুকএর উদ্দেশ্যে একটি স্তুতি রচিত হয়েছে যা একটি আক্কাডিয়ান স্তোত্রের অনুবাদ। লেখক দাবী করেন যে এটি ৩০০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রচিত

"এমন কে আছে যে তোমার শক্তিকে অবহেলা করতে পারে?
তোমার ইচ্ছা এক অনন্ত রহস্য।
স্বর্গে তুমি তা পরিস্ফুটিত কর
এবং মর্ত্যে / সাগরকে শাসন কর
সাগর তোমার আদেশে নত হয়
তুমি ঝড়কে শাসন কর
ঝড় থেমে যায়।
ইউফ্রেটিস নদীর বক্র গতিপথ
তোমারই অধীন।
এবং মেরোডাকের আদেশে
বন্যাও থেমে যায়
প্রভু, তুমিই পবিত্র
তোমার সমান আর কে আছে?
মেরোডাক, তুমি খ্যাতিমান্ দেবগণের শ্রেষ্ঠ"।

দ্বিতীয়তঃ এই পুরোহিত রাজারা, যাঁরা নবী এবং পরিত্রাতার সমতুল্য, সবসময়ে সচেষ্ট ছিলেন একথা বোঝাতে যে তাঁরা শাসকের ভূমিকার জন্য লালায়িত নন। তাঁরা যা করছেন, সবই ঈশ্বরের নির্দেশেএবং তাঁরই প্রতিনিধিরূপে, কারণ প্রভুর আদেশে এটাই তাঁদের কর্তব্য। এইভাবে তাঁরা তাঁদের শাসন প্রণালীকে একটা নৈর্ব্যক্তিক রূপ দিতেন, যদিও দৈবী প্রত্যাদেশের মোড়কে এটা তাঁদেরই শাসন ছিল। তাঁরা বিদ্রোহের আশঙ্কা না ক'রে, ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতেন, কারণ ঈশ্বরই সর্বক্ষেত্রে দায়ী থাকতেন। দৈবী প্রত্যাদেশ ব্যবহার পদ্ধতির মূল অবলম্বন হল ঈশ্বরের সেবক হিসাবে কাজ করার বাধ্যবাধকতা, এটি একটি অভিনব আবিষ্কার। এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মোজেস এবং মহম্মদ দুই প্রধান নবী। যীশুখৃষ্ট নিজেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু যেহেতু তাঁর জীবন অত্যন্ত বিতর্কিত এবং স্বল্প পরিসর, তাই এখানে উদাহরণ রূপে প্রযোজ্য নয়।

ভাল করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে প্রতিনিধির দুটি মহতী আকাংক্ষা আছে—ব্যক্তিগত এবং জাতিগত। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর তীব্র আকাংক্ষা ঈশ্বর নামে অভিহিত না হয়েও তাঁর তুল্য ভালবাসা এবং পূজা লাভ করা। জাতীয় জীবনে, তিনি দেশকে অত্যন্ত ভালবাসেন এবং দেশকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুরক্ষিত করতেসদা সচেষ্ট থাকেন। এটা খুবই স্বাভাবিক যে তিনি তাঁর নেতা-সুলভ গুণগুলিকে নিজস্ব জাতিগোষ্ঠীর উন্নতি বিধানে নিয়োজিত করে থাকেন কারণ সংস্কৃতিগত ভাবে তিনি তাদের সাথে যুক্ত অর্থাৎ একই ভাষাভাষী, একই পরিধেয়, একই প্রথাভুক্ত, একই আচরণবিধি, একই দেশ, একই জাতীয়তাবোধ, একই মানসিকতার অধিকারী, সাধারণতঃ তিনি পরিশীলিত রুচিবোধসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ এবং মহতী গুণাবলীযুক্ত হয়ে থাকেন। **অতএব তিনি অবহিত আছেন যে অনুগামী না থাকলে, নেতা তৈরী হয়না এবং নেতার মাহাত্ম্য অনুগামীদের গুণগত মানের উপর নির্ভর করে। অতএব নবী একজন প্রভূত গুণশালী জাতীয় নেতা যিনি দেশ ও দশের উন্নতিকল্পে নিবেদিতপ্রাণ।**

প্রথমেই এই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদী জাতি এবং মোজেসকে নিয়ে আলোচনা করা যাক।

ইহুদীধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মোজেস ছিলেন আমরাম এবং জোকেবেড এর পুত্র। ইতিহাসের আকস্মিক গতি পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তিনি ফারাও কন্যার কোলে স্থান পেয়েছিলেন এবং মিশরের রাজদরবারে রাজপুত্রের মর্য্যাদায় পালিত হয়েছিলেন। তাঁকে মহতী মিশরীয় কলায় পারদর্শী করে তোলা হয়েছিল,—যথা, আইন প্রণয়ন,

শাস্ত্রব্যাখ্যা, ধর্মশিক্ষা, সামাজিক শাসন ব্যবস্থা এবং যুদ্ধ বিদ্যা এবং যেহেতু মিশর—প্যালেস্তাইন এবং সিরিয়ার কিয়দংশ শাসন করতো, সেহেতু তিনি রাজদরবারের নথিপত্রের মাধ্যমে এইসব দেশের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধীয় জ্ঞান আহরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মূলতঃ যোশেফকে নিয়ে মোট একাত্তর জন ইজরায়েল দেশীয় ইহুদী মিশরে বাস করতে গিয়েছিল। মিশরীয়রা তাদের সাথে অত্যন্ত নির্মম ব্যবহার করে এবং চারশো তিরিশ বছরের মিশরীয় অভিবাসন ছেড়ে তারা চলে যেতে বাধ্য হয়।

অভিনিষ্ক্রমণের সময় তাদের সংখ্যা বলা হয়েছিল ২ কোটি, যা বিদগ্ধ সমালোচকের দৃষ্টিতে পনেরো হাজারে নেমে আসে।যাইহোক্ "ইটারনিটি" বইটিতে এর সংখ্যা অর্দ্ধলক্ষ ধার্য্য করা হয়েছে।

যদিও সেইসময় ইহুদীরা একটি অসংগঠিত জনগোষ্ঠীমাত্র ছিল, প্রধানতঃ তারা ক্যানান (প্যালেস্তাইন) এবং সিরিয়ার অধিকৃত প্রদেশ থেকে এসেছিল। এই তথ্যের সমর্থনে জানা যায় যে দ্বিতীয় আমেন হোতেপ (১৪৫০-১৪২৫ খৃঃ পূঃ) তাঁর নয় বৎসরব্যাপী যুদ্ধে ৮৯, ৬০০ বন্দীকে মিশরীয় মন্দির নির্মাণে দাসের ন্যায় ব্যবহার করেছিলেন।

এই ইহুদীরা ছিল দাসমনোভাবাপন্ন উচ্ছৃঙ্খল জনতা, মানসিক ভাবে বিপর্য্যস্ত, বিষাদাচ্ছন্ন এবং অসংস্কৃত। মোজেস ছিলেন এক মহান্ ব্যক্তিত্ব, নিজেকে তিনি ইহুদীদের সাথে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। রাজপুত্রের মর্য্যাদায় পালিত হয়েছিলেন বলে, তিনি তাঁর আধিপত্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর প্রয়োজন ছিল এমন একটা দেশ ও জাতির যারা তাঁকে যশ ও খ্যাতি দেবে এবং চিরকাল মনে রাখবে। সেইহেতু তিনি প্রাচীন সেমিটিক ঐতিহ্য অনুযায়ী দৈবী প্রত্যাদেশের মাধ্যমে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর দেশ ও জাতিকে একাত্ম করতে চাইলেন। ইহুদীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন হৃদয় সাগ্রহে এই ভাবনাকে বরণ করে নিল, যা তাদের জীবনের অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেবে এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে।

ঈশ্বর এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের দূত মধ্যস্থতা করেন, এই সেমিটিক আদর্শ অনুযায়ী তিনি (মোজেস) আগুনলাগা এবং জঙ্গলের কাহিনীর অবতারণা করলেন এবং তাতে অলৌকিক মাহাত্ম্য সংযোজিত করার জন্য তিনি বললেন যে জঙ্গলটি আগুন লেগে জ্বলছে কিন্তু পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। ক্ষুরধার বুদ্ধি সম্পন্ন

মোজেস বুঝতে পেরেছিলেন যে ইজরায়েলের ঈশ্বর, যিনি আব্রাহাম, আইজ্যাক এবং জেকবেরও দেবতা, তাঁর আবির্ভাব এইরকমই কোনো অলৌকিক, রহস্যময় ঘটনার মাধ্যমে হওয়া উচিত।

সেই সঙ্গে মোজেস তাঁর অনুগামীদের এ কথা জানাতে ভুললেন না যে তিনি তাঁদের নেতা হতে চান না কিন্তু তিনি নেতৃত্ব দিতে বাধ্য হয়েছেন। মোজেস ঈশ্বরকে বলেছিলেন (এক্সোডাস্ ৪. ঃ১০; এক্সোডাস ৩ঃ৮) যে তাঁর বাক্‌পটুতার অভাব এবং তোত্‌লমির জন্য তিনি দৈব প্রতিনিধি হতে প্রস্তুত নন। কিন্তু অবশেষে তাঁকে কর্তৃত্বের ভার নিতেই হল কারণ তাঁর এই মনোভাবে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অতএব মোজেস্ নিরুপায় হয়ে দৈব প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বর মোজেসকে তাঁর অনুগামীদের কাছে পাঠিয়েছেন। এখানে আবার সেই প্রাচীন সেমিটিক ঐতিহ্যকে সক্রিয় দেখা যায়। **প্রথমে মোজেস্ জাতির জন্য একজন ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করলেন তারপর নিজেকে ঈশ্বরের দূত রূপে নিয়োগ করলেন যাতে বিশেষ কিছু অনুশাসন বা আদেশ ঈশ্বরের নামে কার্য্যকরী করা যায়।**

এই ঈশ্বরই ইজরায়েলের ঈশ্বর। তাঁকে “ইয়াওয়ে” বলা হয়, যিনি হিটাইট ঐতিহ্য অনুসারে নিজের নাম প্রকাশ না করে ঘোষণা করেন—“আমিই সে; সেই আমি” (I am that I am).

অবশ্যই সেমিটিক জাতির বিশ্বাস ছিল যে ঈশ্বরের দূতরূপে নিযুক্ত হওয়া এক অত্যন্ত সম্মানের বিষয়, কিন্তু এর অর্থ “বার্তাবহ” নয়। **ঈশ্বরের বার্তাবহ নামেই ঈশ্বরের সেবক, প্রকৃতপক্ষে তিনি মর্য্যাদায় ঈশ্বরের থেকেও বড়—উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ।** এর থেকে আমরা প্রত্যাদেশের রহস্যোন্মোচন করতে পারি কারণ প্রত্যাদেশ প্রভুত্ব বা কর্তৃত্বের হাতিয়ার মাত্র। “ওল্ড টেস্টামেন্ট” থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

গল্পটি এইরকম—ইহুদীদের দ্বারা দ্রবীভূত গোবৎসের আরাধনায় ‘ইয়াওয়ে” ঈর্ষ্যার আগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর দৈবী মহিমায় প্রকাশিত হয়ে ইজরায়েলের পুত্রগণকে তাঁর ক্রোধের আগুনে ভস্মীভূত করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তখনই মোজেস ঈশ্বরের উপরে তাঁর প্রভাব প্রমাণ করবার উপায় খুঁজে পেলেন। তিনি দৃঢ় ভাবে ‘ইয়াওয়ে’ কে জানালেন যে তিনি তাঁর নিজের লোকেদের সাথে অন্যায় ব্যবহার করছেন এবং এই বলে তাঁকে লজ্জা দিলেন যে মিশরীয়রা তাঁকে বিদ্রূপ করবে, যদি তিনি ইজরায়েলীদের ধ্বংস করেন। কারণ ‘ইয়াওয়ে’ নিজেই ইহুদীদের মিশরীয়দের

দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে এক বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

মোজেস ঈশ্বরকে নির্দেশ দিলেন এই পাপ থেকে বিরত এবং অনুতপ্ত হতে। (এক্সোডাস্ ৩২ ঃ ১২-১৪)। কী সাংঘাতিক ঘটনা। ঈশ্বর মানুষের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। এসত্ত্বেও ইহুদীরা তাদের ধর্মবিশ্বাসকে একেশ্বরবাদ বলে অভিহিত করে থাকে। এটিই একমাত্র ঘটনা নয় যখন ঈশ্বরের দূতরূপী মোজেস ঈশ্বরকে সর্বসমক্ষে হতমান করলেন। এরকমই আরেকটি ঘটনায় ইহুদীরা প্রতিশ্রুত ভূমিকে অবহেলা করে মিশরে ফিরে যেতে চাইল। ইয়াওয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের সবাইকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। মোজেস তখন মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে সর্বসমক্ষে ঈশ্বরকে লজ্জা দিলেন। অবধারিত ভাবে ঈশ্বর মোজেসের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। (নাম্বারস্ ১৪ ঃ ১১-২০) ।

একজন নবীর আধিপত্যের ইচ্ছা একজন রাজনীতিকের কর্তৃত্বের আকাংক্ষার থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী। অন্য দেশের উপর আধিপত্য যিনি করে থাকেন সেই অধিরাজের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর আধিপত্য শেষ হয়ে যায়, কিন্তু নবীর ধর্মীয় অনুশাসনের আধিপত্য অক্ষয় হয়ে থাকে। সমাধির পরেও একজন নবী তাঁর অনুগামীদের কাছে বিশেষরূপে পূজা চান। তিনি তাদের সাবধান করে বলেন যে তিনিই শেষ অবতার। তাঁর তিরোধানের পরে কেউ যদি নিজেকে ঈশ্বরের দূত বলে প্রচার করে, তো সে নিশ্চিতরূপে একজন প্রতারক। কিন্তু মৃত্যুর পরেও স্মরণ, মনন এবং পূজা সম্ভব নয় যদি না নবী কিছু সংখ্যক একান্ত অনুগত, নিবেদিতপ্রাণ এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ অনুগামী রেখে যান। এই অনুগামীদের যদি জাতীয় চরিত্র ও একতাবোধ না থাকে তাহলে তারা শুধুমাত্র একদল হীন, উচ্ছৃঙ্খল জনতায় পরিণত হবে এবং সামান্য বাধার সম্মুখীন হলেই তাদের দল বা গোষ্ঠী ভেঙে যাবে। **এই কারণেই ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তিকে জাতীয় নেতা হতে হবে, হয় প্রত্যক্ষভাবে নয় পরোক্ষে।**

মোজেস প্রত্যক্ষভাবেই একজন জাতীয় নেতা ছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাঁর জাতিকে একটি স্থায়ী আবাস বা স্বদেশ দিতে চেয়েছিলেন, যাকে তিনি বলতেন "প্রতিশ্রুত ভূমি";যুদ্ধ ছাড়া এটি সম্ভব ছিল না। তাঁর স্বদেশীয়রা চার শতাব্দী ব্যাপী কঠোর শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায় অত্যন্ত দাস মনোভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিল, যা ছিল আত্মবিশ্বাস এবং স্বাধীনতার পথে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ। তাই মোজেস তাদেরকে কঠোর সামরিকঅনুশাসনে রেখে দিয়েছিলেন। চল্লিশ বছরেরও কিছু বেশী সময় ধরে তিনি তাদেরকে কঠোর ও সুদৃঢ় অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এমন একধরনের জীবনযাত্রা

প্রণালীতে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন, যাকে বলা হত "জুডাইজম্"। যখন ইহুদীদের যাযাবর জীবনে তৃতীয় প্রজন্মের আবির্ভাব হল, তখন মোজেস তাঁর অনুগামীদেরকে অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যার পথে স্থায়ীভাবে ক্যানান প্রদেশে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। ইজরায়েলের পুত্ররা তাদের যোগ্যতার প্রমাণ রাখলো। তারা যুদ্ধ করল, জয়ী হল এবং এক গর্বিত, স্বাভিমানবোধযুক্ত জাতিতে পরিণত হল। তারা যে শুধুমাত্র মোজেসের অনুশাসন মেনেছে, তা নয়, বিশ্বের সভ্যতার ইতিহাসে তারা এক মহৎ অবদান রেখেছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, যখন কেউ নবীরূপে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে আধিপত্য বিস্তার করতে চায়, তখন সে নিজস্ব একটি দেবতার সৃষ্টি করে। যখন অন্য আরেকজননবী হতে চেষ্টা করে তখন সে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতার অস্তিত্বকে ধ্বংস করে নতুন এক দেবতার মূর্ত্তিকে প্রতিষ্ঠা করে, যাতে দৈব প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়ে নিজের নবীত্বকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই সত্য আসুর, মারডুক এবং ইয়াওয়ের উদাহরণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে। তথাপি নবীত্বের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল জাতীয়তাবাদ, কারণ তা সুসংবদ্ধ, জাতীয়তাবাদী, মৌলবাদী একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে, যারা সুকৌশলে এবং শক্তি প্রয়োগের দ্বারা নবীকে অমরত্ব দেবে।

অনুচ্ছেদ-২

নবী মহম্মদ

জাতীয়তাবাদ নবীবাদের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, এই বিষয়টি এখন আরবদেশের নবী মহম্মদ এবং তাঁর আরাধ্য আল্লাহ্ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে।

আবু-অল্-কাসিম মহম্মদ ইব্ন অবদ্ আল্লা ইবন্ অব্দ, অল্ মুত্তালিব ইব্ন হাসিম, ইসলাম এবং আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, মক্কানগরীতে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে স্বীয় পিতার মৃত্যুর পরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি তাঁর পিতামহের আশ্রয়ে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে কাকা আবু তালিব এর অভিভাবকত্বে বড় হয়ে ওঠেন। তাঁর ছয় বছর বয়সের সময় মা আমিনার মৃত্যু হয়। আসাদ গোষ্ঠীর খাদিজার সাথে মহম্মদের বিবাহ হয়। ছাবিবশ বৎসরব্যাপী এই সম্পর্ক সুখের ছিল। মহম্মদ, কুরেশ জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত হাসিম গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। তাঁরা মক্কায় বাস করতেন যেখানে মহম্মদের জন্ম হয়। একটি ছোট শহর হলেও মক্কা একটি বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল এবং পবিত্র 'কাবা'র জন্য সমীহ পেত। কুরেশ গোষ্ঠী, ইহুদী গোষ্ঠীপতি আব্রাহামের পুত্র ইসমায়েলের বংশধর ছিল। এরা দাবী করত যে আব্রাহাম নিজে ইসমায়েলের সাথে যুক্তভাবে 'কাবা'র মন্দিরটি দেবতার উপাসনার জন্য নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বহু শত বৎসর এটি মূর্ত্তিপূজার কেন্দ্র হয়েছিল। মহম্মদ ৮ই জুন, ৬৩২ খৃষ্টাব্দে মারা যান।

মহম্মদের অভ্যাস ছিল হিরা নামে এক মরুগুহার নির্জনতায় সৃষ্টির রহস্য সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করা। ৬১০ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি "হিরায়" ধ্যান করছিলেন তখন ঈশ্বরের দূত গ্যাব্রিয়েল তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন—

পড় ঃ— "তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেন
মানুষকে যিনি তরল বস্তুর ঘনীভূত পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছিলেন।"

পড় ঃ— "এবং ইনি তোমার প্রভু যিনি অনন্ত দয়ার আধার যিনি লিখতে শেখান
মানুষকে শেখান যা সে জানে না।"

এটি আল্লাহ্‌র লিখিত নির্দেশ। গ্যাব্রিয়েল যখন মহম্মদকে পড়তে বললেন, তিনি জানালেন যে তিনি নিরক্ষর এবং পড়তে পারেন না। তখন দেবদূত তাঁর গলা চেপে ধরে আবার পড়তে আদেশ করলেন। তিনবার মহম্মদ জানালেন যে তিনি নিরুপায় এবং তিনবার দেবদূত তাঁর কণ্ঠ রোধ করলেন। মহম্মদ ভীষণ ভয় পেলেন। তাঁর স্ত্রী খাদিজা তাঁকে বললেন যে, তিনি যে আত্মাকে দেখেছেন সে সৎ, শয়তান নয়। খাদিজা তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন যে ঈশ্বর তাঁকে নবী মনোনীত করেছেন। বহু চেষ্টায় তাঁকে নবীত্ব গ্রহণ করতে রাজী করানো হয়েছিল।

এখানে আবার সেই প্রাচীন সেমিটিক ঐতিহ্যের ক্রিয়াশীলতা দেখা যায়, যেখানে নবীকে জোর করে নবীত্ব গ্রহণে বাধ্য করা হয়। মহম্মদের ক্ষেত্রে এটি আরো বিস্ময়কর কারণ সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ চান যে নিরক্ষর মহম্মদ তাঁর বার্তা পাঠ করুক।

পয়গম্বর মহম্মদ তাঁর ধর্মকে 'ইসলাম' নামে অভিহিত করেছেন। অতএব সেমিটিক ঐতিহ্য অনুযায়ী তাঁকে এই ধর্মবিশ্বাস প্রচারের জন্য একজন দেবতার সন্ধান করতে হয়েছিল। বাইব্‌ল দ্বারা সমর্থিত না হলেও পয়গম্বর প্রত্যয়ের সাথে বলেছেন যে 'ইসলাম'ই হ'ল ঈশ্বরের আসল ধর্ম, এবং ঈশ্বর —অ্যাডাম, নোয়া, আব্রাহাম, মোজেস, যীশুখৃষ্ট এবং আরো অনেক নবীকে পাঠিয়েছিলেন এই ধর্মের প্রচার, প্রচলন এবং পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করবার জন্য। অতএব তাঁর দাবী যে যার সর্মথনে তিনি বক্তব্য রাখছেন তা সেই আদি ধর্ম, কিন্তু ইহুদীরা তাকে বিকৃত করেছিল। অতএব ঈশ্বরের আদি ধর্মের পুনর্নির্মাণ কল্পে ইহুদীদের অধিকাংশ নীতি ও আচার আচরণ গ্রহণ করতে তাঁর বিবেকে একটু বাধেনি। এই আদি ধর্মকে তিনি ইসলাম নামে অভিহিত করলেন, যা খৃষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্মের বিরোধী। তিনি ইহুদীদের ধর্মান্তরকরণের নিরলস প্রয়াস করেছিলেন। তিনি ইহুদীদের ধর্মমতের অনেকটাই অধিগ্রহণ করেছিলেন এবং বারবার বলেছিলেন যে ঈশ্বর ইজরায়েলের পুত্রদের মানবজাতির অন্যান্য অংশ অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থান দিয়েছেন। এবং এই বশীকরণের প্রচেষ্টায় তিনি ঈশ্বরের এমন একটা নাম উদ্ভাবন করতে চেয়েছিলেন যা তাঁর নিজের লোক আরবদের এবং ইহুদীদের উভয়ের কাছেই আকর্ষণীয় হতে পারে।

পণ্ডিতেরা বলেন যে ইহুদীদের পূর্বপুরুষেরা এল্ নামে এক দেবতার আরাধনা করতেন (জেনেসিস ১৬ঃ২৩; ১৭ঃ১;২১ঃ৩৩,৩১ঃ১৩;৩৫ঃ৭) জেকব "এল

এলোহে ইজরায়েল" নামে এক বেদিকা নির্মাণ করেছিলেন, যার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—"এল্" ইজরায়েলের দেবতা। সেইরকম "এল", সিরো-প্যালেস্তিনীয় সর্ব দেবতার মন্দিরে একজন উঁচু স্তরের দেবতা ছিলেন। আবার বাইবেলে বলা হয়েছে যে **সর্বেশ্বরবাদীদের বিশাল মন্দিরে "এল্" এর অধীনে 'ইয়াও য়ে' একজনদেবতা সদস্য ছিলেন।** আরবী ভাষায় 'এল' হচ্ছেন "আল্লাহ্"। অতএব ইসলামীয় ঈশ্বরের "আল্লাহ্" নাম সুপ্রযুক্ত কারণ তিনি একদা "ইয়াওয়ে"র উধর্বতন পদাধিকারী দেবতা এবং আরব জাতির কুরেশ গোষ্ঠীরও দেবতা, যিনি "কাবার প্রভু" নামে খ্যাত।

মনে রাখতে হবে যে সেমিটিক প্রত্যাদেশ জনিত ঐতিহ্য অনুযায়ী নবী চান যে তাঁকে ঈশ্বর নামে অভিহিত করা হবে না কিন্তু ঈশ্বরের মর্য্যাদা দিতে হবে। এছাড়া তিনি একজন জাতীয় নায়ক কারণ তিনি এমন একদল অনুগামী গড়ে তুলতে চান যারা তাঁকে এবং তাঁর নামকে স্মরণীয় করে রাখবে।

জাতীয় স্বার্থের কারণে নবী, সর্বোচ্চ দেবতারূপে "আল্লাহ্‌র" স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন। সেইসময় আরব উপদ্বীপে ইহুদীদের সামাজিক অবস্থান খুব উন্নত ছিল। এর কারণ তাদের গৌরবময় ইতিহাস, ধর্মীয় অগ্রাধিকার, রাজনৈতিক নির্যাতনের অবজ্ঞাপুর্ণ বিরোধিতা এবং বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি। মহম্মদ বুঝেছিলেন যে যদি না ইহুদীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং আরবদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাঁর নিজের লোকেদের উন্নততর স্তরে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তারা যদি সম্মত না হয় তবে তাদের হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক রূপে গণ্য করা হবে, নয় তাদের নির্বাসিত করা হবে।

প্রথমে ইহুদীদের আস্থাভাজন হবার জন্য পয়গম্বর জেরুসালেমকে কিব্‌লা'র মর্যাদা দিলেন এবং তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। কোরাণে আছে—

["দ্য কাউ" -সূরা বাকারাহ্-৪০] "হে ইজরায়েলের সন্তানগণ! আমার সেই অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ কর যার দ্বারা আমি তোমাদের অনুগৃহীত করেছি এবং অন্য সব প্রাণীদের উপর তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছি......"

ইহুদীদের ইসলামধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য মহম্মদ, আব্রাহামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন কারণ তিনি ইহুদী ও আরব উভয়েরই পূর্বপুরুষ। নবী চাইতেন এই দুই জাতি একাত্ম হোক। কোরাণে আছে—

['উইমেন,' -সূরা নিসা-১২৫] "আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম যে পরোপকারী হ'য়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে আব্রাহামের

ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? এবং আল্লাহ্ আব্রাহামকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।"

['দ্য পিলগ্রিমেজ'—সূরা হজ-৭৮] "এ ধর্ম (ইসলাম) তোমাদের পিতা আব্রাহামের ধর্মের অনুরূপ। আল্লাহ্ পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম'।"

যখন ইহুদীরা এই সাদর সম্ভাষণকে অবজ্ঞা করলো ঈশ্বরের দূতের প্রচণ্ড ক্রোধের সম্মুখীন হ'ল। তখন পয়গম্বর জেরুসালেমকে প্রদত্ত "কিব্‌লা" আরবদের "কাবা"কে প্রদান করলেন। এরপর তিনি ইহুদীদের অভিশাপ দিলেন—

['উইমেন।' সূরা নিসা-৪৬] "কিন্তু তাদের অবিশ্বাসের জন্য আল্লাহ্ তাদের অভিসম্পাত করেছেন।"

বিগত ১৪০০ বছর ধরে মোল্লারা এই অভিশাপের ব্যাখ্যা করেছেন যে ইহুদীরা চিরকাল গৃহহীন হয়ে থাকবে, তাদের দেশ থাকবে না এবং কোনোদিন নিজেদের জাতীয় সরকার গঠন করতে পারবে না। মুসলিমরা ইজরায়েলের সবাইকে ডুবিয়ে মারতে চায় কারণ ইজরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কোরাণের পংক্তির বিরোধিতা করে। যেহেতু ইহুদিরা আরবজাতির অংশমাত্র হতে অস্বীকার করেছিল; অতএব তাদের অভিশপ্ত জাতি বলে শাস্তি দেওয়াই যথেষ্ট হয়নি। একটি অবিমিশ্র, পবিত্র জাতি গঠনের দাবীতে ইহুদীদের আরব দেশ থেকে নির্বাসিত করাই স্থির হল। অতএব জাতিগত বিশুদ্ধিকরণের কার্য্যক্রম অনুযায়ী ইহুদীদের নির্বাসিত করা হল। **এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে ইসলাম শুধু ধর্ম নয়, এ হ'ল মুখ্যতঃ আরবদের জাতীয় আন্দোলন।**

বরাবরই ইহুদীরা তাঁদের জাতিগত মর্য্যাদার জন্য গর্ববোধ করে থাকেন, কারণ ইয়াওয়ে, ইহুদিদের দেবতা তাদেরকে নিজের লোক বলে নির্বাচন করেছেন ইহুদী গোষ্ঠীপতি নোয়া এবং আব্রাহামের সাথে চুক্তি অনুযায়ী। আব্রাহামের দুটি পুত্র আইজাক এবং ইসমায়েল। বাইবেলে আছে (জেনেসিস-১৭-১৮) যে ঈশ্বর ইহুদী গোষ্ঠীপতি আইজাকের সাথে এক অবিনশ্বর চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু কোরাণে অন্য কথা বলে—

['দ্য কাউ'—সূরা বাকারাহ্-১১৫] "আমরা (আল্লাহ্) আব্রাহাম ও ইসমায়েলের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলাম"

এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই যে ইহুদীরা ওল্ড টেস্টামেন্টকে কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে পরিবর্তন করেছিল। তাদের এরকম কিছু করতে হয়নি কারণ এই

বক্তব্য তাদের ধর্মপুস্তকে ছিল কোরাণ রচনার বহু শতাব্দী আগে থেকেই। এইভাবে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে নবী নিজের জাতির গৌরববৃদ্ধির জন্য তাদের উপর দেবোপম পবিত্রতা আরোপ করেছিলেন। পয়গম্বরের দ্বারা আল্লাহ্‌র মহিমাকীর্ত্তন, যে আল্লাহ্ সবার উপরে এবং একমাত্র দেবতা, এ হ'ল আরব জাতীয়তাবাদের অঙ্গ। প্রথমতঃ আল্লাহ্" ইয়াওয়ে"র ও ঊর্দ্ধে, অতএব আল্লাহ্‌র ভক্ত আরবরাও "ইয়াওয়ে"র ভক্ত ইহুদীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। ইয়াওয়েকে ইজরায়েলের দেবতারূপে গণ্য করা হয় তাই শ্রেষ্ঠতর বলে আল্লাহ্‌কেও সারা বিশ্বের দেবতারূপে গণ্য করা উচিত। এটাই নবী ঘোষণা করেছিলেন। এই জন্যই আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ এবং সর্বত্র বিরাজমান। 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ইয়াওয়ে'কে এত প্রকার গুণের অধিকারী বলে মনে করে না।

কিসের জন্য আল্লাহ্‌কে এতো মহিমাময় এবং একমাত্র ঈশ্বররূপে গণ্য করা হয়? তার কারণ তিনিই একমাত্র আরব দেবতা, যাঁর মূর্ত্তি কাবা'র মতো পুণ্যস্থানে বহুশতাব্দী ব্যাপী পূজিত হয়েছিল। যদিও 'কাবা'তে আল্লাহ্‌ই একমাত্র দেবতা ন'ন, কারণ কাবা ছিল বহু মূর্ত্তিপূজার স্থান। বিদেশী ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব হিন্দুমন্দিরের মতো পৌত্তলিকতা এবং হিন্দু ভাবধারা ত্রিমূর্ত্তি অর্থাৎ একের মধ্যে তিন, এই মতবাদ এই সবের সম্মেলনে গঠিত হয়েছিল 'কাবা'। 'কাবা'তে আল্লাহ্ তাঁর তিন কন্যাসহ পূজিত হতেন।

ঐতিহাসিকরা কাবাকে মক্কার মন্দির বলে থাকেন। কুরেশ জনগোষ্ঠী বংশপরম্পরা অনুযায়ী 'কাবার প্রভু' বলে সম্মানিত। এই জন্য এদের "আল্লাহ্‌র নিজের লোক" এবং "আল্লাহ্‌র সংরক্ষিত প্রতিবেশী" বলা হ'ত। আল্লাহ্‌র মূর্ত্তি তখনও আরবদের হৃদয়ে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে সব গোষ্ঠী কাবা অভিমুখে তীর্থযাত্রা করতো তাদেরকে "আল্লাহ্‌র অতিথি" বলে গণ্য করা হতো। এতো সব দেবতাসুলভ সম্মান পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্ সর্বেশ্বরবাদের মন্দিরে বহুদেবতার অন্যতম ছিলেন। সেই জন্য পয়গম্বর আল্লাহ্‌কে একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঘোষণা করলেন এবং অন্য দেবতাদের বাতিল করে দিলেন। একথা মনে রাখা উচিত যে মহম্মদ তাঁর জ্ঞাতি কুরেশদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করতেন, এইজন্য তিনি নিয়ম করলেন যে একমাত্র কুরেশরাই দেশ শাসন করবার অধিকারী। আরো বিশদ আলোচনার আগে এটুকু বললেই হবে যে আরবরা জাতি হিসাবে শ্রেষ্ঠ হতে পারে তখনি যখন তারা একমেবাদ্বিতীয়ম্ এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ লাভ করবে, যিনি নিজেই আরব, যেমন কিনা ইয়াওয়ে ইহুদী ছিলেন। যেহেতু প্রত্যাদেশ সংক্রান্ত মতবাদ

পৃথিবীর অর্দ্ধাংশেরও অধিক জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে থাকে, এটি ধর্ম এবং সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনশাস্ত্রের এক প্রধান আলোচ্য বিষয়বস্তু।

সেইহেতু একজন দৈবী প্রত্যাদেশ প্রয়োগকারী ঈশ্বরের দূতের মানসিক গঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রয়োজনীয়। তিনি কর্তৃত্ব প্রবণ কিনা জানা দরকার। প্রত্যাদেশের স্বরূপ উদ্ঘাটনে এই তথ্য সহায়ক হবে।

এইজন্যই "হাদিস্" এর সাহায্য নেওয়া আবশ্যক। পয়গম্বরের বাণী এবং আচরণ পদ্ধতি, যা ইসলামিক ঐতিহ্য রূপে স্বীকৃত, তারই বিবরণীকে হাদিস বলা হয়। সাধারণতঃ কোরাণ অবিশ্বাসীদের তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যুক্তি দেখানোর আহ্বান জানিয়ে থাকে। মুসলিমদের কাছে যা প্রশ্নতীত সত্য সেই বিষয়ে যদি অন্য ধর্মাবলম্বী কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বংশগরিমার ভিত্তিতে একই প্রকারের দাবী জানায়, তাহলে কী তা মুসলিম সমাজে গ্রাহ্য হবে? এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। **একটি সৎ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে এটাই পথনির্দেশিকা রূপে কাজ করবে যার ভিত্তিতে সে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে।**

পয়গম্বর দাবী করেন ঃ—

১। ঈশ্বর আব্রাহামের পুত্র ইসমায়েলের সন্ততিদের শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত করেছিলেন। ইসমায়েলের বংশধরদের মধ্যে কুরেশদের (মহম্মদের গোষ্ঠী) শ্রেষ্ঠ বলে ঈশ্বর নির্বাচন করেছিলেন। কুরেশদের মধ্য থেকে ঈশ্বর "বানু হসিমকে (মহম্মদের পরিবার) শ্রেষ্ঠ বলে বেছে নিলেন এবং বানু হাসিমদের মধ্য থেকে ঈশ্বর মহম্মদকে সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচন করেছিলেন।

(জামে টার্মজে ২য় খণ্ড)

এই হদিস্ জেনেসিস ১৭ঃ১৯-২১ এ উল্লিখিত ইহুদীদের দাবীর বিরোধী। ইহুদীরা আইজ্যাকের উত্তরসূরী। তারা বিশ্বাস করে যে একমাত্র আইজ্যাকই আব্রাহামের বৈধ সন্তান যিনি তাঁর স্ত্রী 'সারা'র গর্ভজাত, আর ইসমায়েল, 'সারা'র মিশরীয় দাসী 'হাগারে'র অবৈধ সন্তান। ঈশ্বর আইজ্যাকের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, ইসমায়েলের সঙ্গে নয়। ইসমায়েলের সন্তান আরবদের ইহুদীদের থেকে বেশী প্রাধান্য দেওয়াটা জাতীয়তাবাদী প্রক্রিয়া বিশেষ। এর থেকে বোঝা যায় যে ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল আরবদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করে তাদের এক মহান জাতিতে পরিণত করা।

২। দু'টি উপজাতির মধ্যে ইসমায়েল ও আইজ্যাকের বংশধরদেরকে শ্রেষ্ঠ বলে ঈশ্বর নির্বাচন করেছিলেন। ঈশ্বর ইসমাইলের সন্ততিদের (আরব) আইজ্যাকের সন্ততিদের (ইহুদী) চেয়ে বেশী পছন্দ করেছিলেন। তারপর ঈশ্বর নির্বাচিত জনজাতি কুরেশদের (ইসমায়েলের বংশধর) মধ্যে মহম্মদকে সৃষ্টি করলেন।

(জামে টার্মজে ঃ ২য় খণ্ড)

৩। মহম্মদকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কখন তাঁকে পয়গম্বর করা হল। তিনি বললেন যখন অ্যাডাম এর শরীর ও আত্মা সৃষ্টি হচ্ছিল তখন তাকে পয়গম্বর করা হয়েছিল।

"সাহী মুসলিম" অনুযায়ী নবীত্বের এই মহিমা মহম্মদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল যখন তাঁর বয়স চল্লিশ বছর। এটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার যে অ্যাডামেরও পূর্বে সৃষ্ট পয়গম্বর হওয়া সত্ত্বেও মহম্মদ নবীত্বের কোনো দাবীই করেননি যতদিন না তিনি চল্লিশ অতিক্রম করেন। এবং জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর তিনি নবীসুলভ কোনো কর্তব্যই পালন করেন নি।

৪। ঈশ্বর মহম্মদকে সকল মানুষের শ্রেষ্ঠরূপে নির্বাচিত করেছেন। এটা কোনো মিথ্যা গর্ব নয়, এ সত্য ঘটনা।

(জে.টি.২য় খণ্ড)

৫। শেষ বিচারের দিনে মহম্মদ ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে আসন গ্রহণ করবেন। তিনি ছাড়া অন্য কারোর এই অধিকার বা ক্ষমতা থাকবে না।

(জে.টি. ২খণ্ড)

৬। শেষ বিচারের দিনে মহম্মদকে "ওয়াসিলা" বা 'আশ্রয়' রূপে প্রার্থনা কর অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যাঁর, পাপ ক্ষমা করবার জন্য মধ্যস্থতার ক্ষমতা আছে। এই ভাবে তিনিই হবেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি স্বর্গলাভের জন্য মধ্যস্থ হবেন।

(জে.টি. ২য় খণ্ড)

৭। শেষ বিচারের দিনে মহম্মদ সকল মানুষের মধ্যে প্রধান হবেন।

(জে.টি. - ২য় খণ্ড)

৮। মহম্মদই প্রথম ব্যক্তি যাঁকে 'মধ্যস্থ' পদ দেওয়া হবে। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যাঁর মধ্যস্থতা গ্রাহ্য করা হবে। তিনিই স্বর্গের দরজার তালা খুলে প্রথম সেখানে প্রবেশ করবেন, তাঁর অনুগামীরা তাঁর অনুগমন করবেন। যারা তাঁর আগে এসেছে

(জন্মেছে) এবং পরে আসবে সকল মানুষের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। এটা গর্বের বিষয় নয়, সত্য।

(জে.টি. -২য় খণ্ড)

৯। পয়গম্বরের উদ্দেশ্যে "দরুদ" কর, অর্থাৎ মহম্মদের কাছে প্রার্থনা কর, মিনতি কর এবং স্তুতি কর। যে একবার মহম্মদের উদ্দেশ্যে "দরুদ" করে, ঈশ্বর তাকে দশগুণ আশীর্বাদ করেন।

(জে.টি.-২য় খণ্ড)

এই হাদিসগুলির বক্তব্য সুস্পষ্ট এবং টীকা নিষ্প্রয়োজন। বিষয়টি স্পষ্ট হবে যদি আমরা ইসলাম ধর্মের ঈশ্বর, "আল্লাহ্‌র" সাথে মহম্মদের সম্পর্কটা বুঝতে পারি। কিছু উদাহরণ দেওয়া হল :—

১। ইসলামধর্মের মূল নির্দেশিকা হল "শাহাদা"। এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তিকে মুসলিম বলা হয়। এর অর্থ হল:—

একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো পূজা পাবার অধিকার নেই এবং মহম্মদ হচ্ছেন তাঁর দূত।

"শাহাদা"র অর্থ বুঝতে হলে আল্লাহ্‌র অধিকার সম্বন্ধে জানতে হবে।

['দ্য কাউ'-সূরা বাকারাহ্-১৬৫] "যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করেছে তারা আল্লাহ্‌কে সব চাইতে বেশী ভালবাসে।"

['ক্যাট্‌ল্'-সূরা আন্‌আম-৪৫] "প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

স্তুতি এবং পূজায় তাঁর অধিকার সম্বন্ধে আল্লাহ্ সুস্পষ্ট ভাবে কোরাণের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন।

['দ্য স্ক্যাটারার্স'—সূরা যারিনা ৫৬] "আমার দাসত্বের জন্য আমি মানুষ ....সৃষ্টি করেছি।"

বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ্ বারবার বলেছেন যে তিনি মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর পূজা এবং স্তুতি করবার জন্য সৃষ্টি করেছেন। খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার যে আল্লাহ্ যিনি সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান্, তিনি মানুষের কাছ থেকে তাঁর পছন্দ মতো স্তুতি

ও পূজা পান না, তাঁকে নবী, দেবদূত, প্রভৃতিকে পাঠাতে হয় যাঁরা মানুষের মনে নরকের ভয় এবং স্বর্গের আশ্বাস জাগিয়ে প্রত্যয় জন্মান। তা সত্ত্বেও পরিণামে মানব সমাজে আরো বিভেদ, অবিশ্বাস এবং পাপের বাতাবরণ তৈরী হয়। যেহেতু "শার্ক" অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোনো দেবতার আরাধনা হচ্ছে একমাত্র ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ, সেহেতু স্পষ্টই বোঝা যায় যে ঈশ্বর যদি সত্যিই সৃষ্টিকর্তা, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান হতেন এবং যদি তাঁর পূজা পাবার প্রচণ্ড আকাংক্ষা থাকতো, তবে ইচ্ছা করলেই তো তিনি একান্ত বাধ্য মানুষ তৈরী করতে পারতেন। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে আল্লাহ্ ন'ন, কোনো মানুষই ঈশ্বরের মতো মর্য্যাদা এবং পূজা পেতে আগ্রহী। এই সত্যের উপলব্ধি হয় "শাহাদা"র দ্বিতীয় অংশে।

২। পয়গম্বরের অধিকার—

ক) যদিও পয়গম্বর নিজেকে আল্লাহ্‌র আব্‌দ্ বা দাস বলে ঘোষণা করেন, আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর তৈরী আইনেরও ঊর্দ্ধে স্থান দিয়ে থাকেন। যেমন একজন মুসলিম একই সাথে চারজনের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে না, কিন্তু মহম্মদের একই সাথে ন'জন স্ত্রী ছিলেন।

খ) আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে নবী যে কোনো ব্যক্তির বিধবা বা বিবাহ-বিচ্ছিন্নাকে বিবাহ করতে পারেন, কিন্তু নবীর বিধবা বা বিবাহ-বিচ্ছিন্নাকে বিবাহ করা বিকৃত মানসিকতা বলে পরিগণিত।

(দ্য কনফেডারেটস্ সূরা আহ্‌যাব ৫০)

গ) বহুবিবাহের নীতি অনুসারে একজন মুসলিমকে তার সব স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহারে সমদর্শী হতে হবে, কিন্তু নবী আইনসম্মত ভাবেই তাঁর যে কোনো স্ত্রীকে সাময়িক ভাবে বা অনির্দ্দিষ্টভাবে তার ন্যায্য অধিকার থেকে ইচ্ছামতো বঞ্চিত করতে পারেন বা দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন।

(দ্য কনফেডারেটস্ সূরা আহ্‌যাব ৫০)

ঘ) আল্লাহ্ নবীকে খুশী করার জন্য ব্যাকুল। তিনি ধর্মবিশ্বাসীদের নির্দেশ দিয়ে থাকেন কিভাবে নবীর গৃহে প্রবেশ করা উচিত, কতক্ষণ সেখানে থাকা উচিত এবং যতক্ষণ তারা নবীর গৃহে থাকবে ততক্ষণ অলস গালগল্পে মনোনিবেশ না করা।

(দ্য কনফেডারেটস্ সূরা আহ্‌যাব ৫০)

ঙ) আল্লাহ্‌র প্রার্থনা করার জন্য নির্দিষ্ট দিক্ অর্থাৎ "কিব্‌লা" পরিবর্ত্তন শুধুমাত্র নবীকে খুশী করার জন্য। এটি নিশ্চিতরূপে দৈবী ব্যবস্থাপনায় এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন।

(দ্য কাউ সূরা বাকারাহ্ —১৪৪)

চ) নবীর স্ত্রী আইশা কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন যখন খাউলা বিন্‌ট হালো নবীর কাছে বিবাহবন্ধনের মধ্য দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করলেন, কিন্তু যখন ঈশ্বর প্রত্যাদেশ দিলেন— "তুমি ইচ্ছামতো তাদের যে কোনো জনকে (তোমার স্ত্রীদের) ত্যাগ করতে পারো" (৩৩ : ৫১)

আইশা বিস্ময়ভরে বললেন "ঈশ্বর তোমাকে খুশী করবার জন্য ব্যাকুল" (সাহী অল্ বোখারি ৭ম খণ্ড)

ছ) প্রকৃত পক্ষে, আল্লাহ্ পয়গম্বরের সর্বপ্রকার কার্য্যের সহায়ক রূপে কাজ করেন। তিনি ধর্মবিশ্বাসীদের বলেন তারা যেন নবীর সামনে না হাঁটে এবং তাঁর থেকে উচ্চকণ্ঠে বাক্যালাপ না করে। (অ্যাপার্টমেন্টস্ সূরা হুজোরাত ১)

নবী এইসব নির্দেশ নিজেই দিতে পারতেন। যখন কেউ নবী আর আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে, তখন এই উপলব্ধি হয় যে যদিও কোরাণ শুরুতে মহম্মদকে মানুষ রূপে দেখায়, কিন্তু ক্রমে ঐ সম্পর্ক দ্বৈত ভাবাপন্ন হয়ে যায় এবং মোজেস এর মতো মহম্মদ ঈশ্বরের থেকে বড়ো হয়ে ওঠেন।

এটি একটি স্পর্শকাতর বিষয় কিন্তু নিরপেক্ষতা দাবী করে যে প্রদত্ত যুক্তিগুলি বিচার করে তবে কোনো সিদ্ধান্তে আসা উচিত। মহম্মদ কর্তৃক নিজের মনুষ্যত্বকে দেবত্বে পরিণত করার প্রক্রিয়া খুবই জটিল এবং সময়সাপেক্ষ, কিন্তু বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত এবং সরল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

১। ধর্মবিশ্বাস অনুসারে একজন বিশ্বাসী ভক্ত আল্লাহ্‌কে স্বভাবতঃই ভালবাসবে, কিন্তু এই শর্তই যথেষ্ট নয়, কোনো ব্যক্তিকে ধর্মবিশ্বাসী বলা যাবে না যদি না সে নবীকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসে "তার পিতারও অধিক, সন্তানেরও অধিক এবং সকলের চেয়ে বেশি।"

(সাহী অল্ বখ্ ১ম খণ্ড)

২। মহম্মদ আল্লাহ্‌র তুল্য শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী কারণ তাঁর আল্লাহ্‌র মতোই নিরানববইটি গুণ আছে।

আল্লাহ্ সর্বব্যাপী বলে মানুষের ঘাড়ের ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর (সূরা ক্বাফ্, ১৬) "পয়গম্বর ধর্ম বিশ্বাসীদের সত্তার থেকেও নিকটতর" (দ্য কনফেডারেটস সূরা আহ্যাব -৫),

৩। প্রথম দিকে নবী একজন মানুষ এবং ঈশ্বরের সেবক, এইরূপ ধারণা প্রচার করা হলেও, যখন তিনি ধীরে ধীরে শক্তিশালী হয়ে ওঠেন তখন মহম্মদের প্রতি আনুগত্য, ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যের মতো আবশ্যিক হয়ে ওঠে।

[সূরা আল-ই-ইমরাণ;৩২, ১৩২] "আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত হও।" "তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অনুসরণ কর যাতে তোমরা কৃপালাভ করতে পার।"

[সূরা নিসা ঃ ১৩] " যে আল্লাহ্র ও রসূলের অনুগত হ'য়ে চলবে, আল্লাহ্ তাকে স্বর্গে স্থান দান করবেন।"

ক্রমে পয়গম্বর ঈশ্বরের মতো কর্তৃত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠেন।

[সূরা আহ্যাব ঃ ৩৬] "আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল কোনও বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন বিশ্বাসী পুরুষ বা বিশ্বাসী নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে না। কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে অমান্য করলে সে তো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।"

নিজেকে ঈশ্বরের সহ-অধিনায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা করে তিনি (মহম্মদ) তাঁর নিজস্ব মহিমা ও গুরুত্বকে বর্ণনার অতীত করে তোলেন কারণ এই গুণগুলিই তাঁকে বিশ্বব্যাপী পাপীদের ত্রাণকর্তা রূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

[দ্য প্রফেট্স্ ১০০] "সকল প্রাণীর প্রতি করুণা স্বরূপ তোমাকে প্রেরণ করেছি।"

সবাই যাতে পয়গম্বরের অনুগত থাকে এবং তাঁকে আদর্শরূপে পুরোপুরি অনুসরণ করে, এইজন্য কোরাণ পয়গম্বরকে "ব্যবহারিক জীবনের আদর্শ" রূপে ঘোষণা করেছে।

['দ্য কনফেডারেট্স্—সূরা আহ্যাব ঃ ২১] " তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রসূলের চরিত্রের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।"

প্রথমে তাঁর (নবী) মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন যে তিনি তাঁর নিজের কন্যা ফতিমাকে, যাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন, তাকেও বাঁচাতে

পারেননি। তারপর তাঁর নবীত্বের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমমর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন।

[দ্য ডার্কেনিং ঃ ১৫-২০] "প্রকৃতই এটা মহান্ রসুলের বাক্য যাঁর ক্ষমতা সিংহাসনে আসীন আল্লাহ্ দ্বারা স্বীকৃত, আল্লাহ্ যাঁকে বিশ্বাস করেন ও মানেন।"

বিগত বহু শতাব্দী ধরে মোল্লা ও সাধারণ মুসলিমদের ধারণা ছিল যে কোরাণ অনুসারে "শেষ বিচারের দিন," ঈশ্বর তাঁর সিংহাসনে বসবেন এবং মহম্মদ তাঁর সিংহাসনের ডান দিকে আসন গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ মধ্যস্থতা করবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা মহম্মদকে দেবেন এবং মহম্মদই ঠিক করবেন কে স্বর্গে যাবে আর কে নরকে। **বিচারের মান কাজের উৎকর্ষের ভিত্তিতে নয়, কে পয়গম্বরকে কতখানি ভালবেসেছে তার ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে। ইহুদীরা নরকগামীদের শীর্ষে থাকবে এবং তার পরেই থাকবে খ্রীশ্চানরা**। হিন্দু, বৌদ্ধ, পৌত্তলিক নিরীশ্বরবাদী সবার ভাগ্যই এইভাবে নির্দ্ধারিত হবে। কিন্তু খুনী, ধর্ষণকারী, দস্যু, লুণ্ঠনকারী, অগ্নিসংযোগকারী, প্রতারক প্রভৃতি, যে জীবনে একবারও মহম্মদের নাম সাদরে উচ্চারণ করেছে, এবং তাঁর নবীত্বে বিশ্বাস রেখেছে, তারা সবাই স্বর্গে যাবে। সেখানে তাদের প্রত্যেককে সত্তরটি করে সুন্দরী কুমারী কন্যা এবং বেশ কিছু সংখ্যক সুন্দর তরুণ উপভোগের জন্য প্রদত্ত হবে। আল্লাহ্‌র কৃপা স্বীকার করার পুরস্কারস্বরূপ তাদের পৌরুষ শতগুণে বর্দ্ধিত হবে।

মুসলিমরা একথা বিশ্বাস করে।

ধীরে ধীরে নবীর মহিমা আল্লাহ্‌কেও অতিক্রম করে।

[সূরা আহ্যাব ঃ ৫৬] "আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশ্‌তা গণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাঁকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর।"

ধ্যানের মাধ্যমে শান্তি এবং আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা, যা বেশীর ভাগ ধার্মিকেরা করে থাকেন, তাই ধর্মীয় আরাধনার সারসত্য।

মুসলিমরা এক্ষেত্রে শীর্ষস্থানীয়। তারা যদিও মহম্মদের পূজা করে কিন্তু দাবী করে থাকে যে তারা আল্লাহ্‌রই স্তুতি করে। অথচ বলে থাকে যে আল্লাহ্‌র সাথে আর কারো পূজা করা মানে "শার্ক", যা "ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।"

এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। এখানে মানুষ ঈশ্বরের আরাধনা করছে না,

ঈশ্বর নিজেই তাঁর স্বর্গীয় সহযোগীদের সাথে মানুষের পূজা করছেন। এটাই প্রত্যাদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য। প্রত্যাদেশ প্রকৃতপক্ষে সেই কর্তৃত্ব সন্ধানীর হাতিয়ার, যে তার সমমর্য্যদার মানুষের কাছে ভালবাসা এবং পূজা দাবী করে যার জন্য সে নিজেকে পরোক্ষভাবে ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠা করে থাকে। ইতিহাস প্রমাণ করে, যখনই নবী তাঁর চুল কেটেছেন তখনই তাঁর অনুগামীরা কাড়াকাড়ি করে তাঁর কর্তিতকেশাংশ এবং নখ সংগ্রহ করেছে দৈবী স্মারকরূপে। এমনকি তারা তাঁর থুতু ও মুখ ধোয়া জল ও সংগ্রহ করেছে। করেণ তারা মনে করতো যে এই সবের বিভূতি ও মাহাত্ম্য তাদের রোগ নিরাময় করবে ও মুক্তি দেবে।

এছাড়া প্রতিটি নবজাতকের অবচেতন মনে নিজের দৈবী সত্ত্বার প্রভাব রাখার জন্য তিনি শিশুর জন্মের পরমুহূর্ত্তেই তার কানে "ঈশ্বরের দূত" এই নাম জপ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সালে লোরেনজ মনের উপর প্রভাব বিস্তারের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন ১৪টি শতাব্দী পূর্বেই মহম্মদ তা জানতেন। এ হল আসলে একধরনের কার্য্যকরী মগজ ধোলাই পদ্ধতি। প্রত্যাদেশ হল মগজ ধোলাই এর সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম কারণ এটা অন্ধবিশ্বাসকে সাহায্য করে যা যুক্তির খোলা দরজাগুলি বন্ধ করে দেয়।

পাঠকের জানা উচিত আল্লাহ্ কী ধরণের ঈশ্বর, তিনি আত্মপ্রশংসায় উন্মাদ।

['দ্য মাস্টারিং' সূরা হাশ্‌র ২৩-২৪] "তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোনও উপাস্য নেই, তিনি রাজা, তিনি রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অহংকারের অধিকারী; ওরা যাকে অংশী স্থির করে আল্লাহ্ তা হতে পবিত্র, মহান্, তিনিই আল্লাহ্, সৃজন কর্ত্তা, উদ্ভাবন-কর্ত্তা, রূপ দাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। অকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"

মানুষ নয়, আল্লাহ্ নিজেই নিজের প্রশংসা করছেন। এটি তাঁর কর্তৃত্ব প্রবণতা স্পষ্ট করে।

স্পষ্টতই আল্লাহ্ প্রশংসার কাঙাল। যখন মানুষ তাঁর স্তুতি করে, তিনি প্রসন্ন হ'ন, আর যখন মানুষ তাঁকে অবহেলা করে, তিনি দুঃখ পান। আল্লাহ্ কী অস্থিরমতি! ভক্তের স্তাবকতার দ্বারা তাঁর অহংবোধকে তৃপ্ত করার জন্য তিনি এমন কাজ করেন যা নৈতিকতার বাইরে। আকর্ষণীয় তরুণী ও তরুণ দ্বারা পরিপূর্ণ স্বর্গলাভের সম্ভাবনার উৎকোচ দিয়ে তিনি মানুষকে প্রলোভিত করেন। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মনে

জ্বলন্ত নরকবাসের শাস্তির সম্ভাবনা জাগিয়ে বিকৃত প্রবৃত্তি প্রদর্শন করেন। বারবার ঘোষণা করে থাকেন যে তিনি প্রচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং তাঁর প্রতিশোধমূলক শাস্তির সীমা পরিসীমা নেই। এমনকি তিনি অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপ করেন এবং ভুল পথে পরিচালনা করে থাকেন। তিনি তাদের প্রতি অভিশাপ ও কটু কথা প্রয়োগ করেন।

আসলে যারা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে না তাদের তিনি ঘৃণা করেন। এবং তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, যতক্ষণ না তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কিংবা তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে। একি সত্যিই কোনো প্রকৃত দেবতার চরিত্র? ইনি কখনোই সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন না। যদি তাই হতো তবে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করতেন তাঁর বাধ্য হওয়ার জন্য। কারণ স্তুতি, আরাধনা এবং সমর্পণ তাঁর অত্যন্ত আকাংক্ষিত বস্তু, এসব না পেলে তিনি অসুখী ও অসন্তুষ্ট হ'ন। যদি তিনি নিজেকে সুখী করতে না পারেন, তাহলে তিনি অন্যদের কীভাবে সুখী করবেন? বিশেষতঃ যখন তাঁর সুখ পুরোপুরি মানুষের কর্মের উপর নির্ভরশীল, তখন তিনি কখনই ঈশ্বর হতে পারেন না। ইনি অবশ্যই একজন প্রত্যাদেশবাদী, যিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধির ভেক্ ধরে ঈশ্বরের মর্য্যাদা চান।

পয়গম্বর মহম্মদের জনপ্রিয়তার তিনটি মূল কারণ আছে।

১। প্রথমতঃ তিনি একজন অদম্য প্রাণশক্তির অধিকারী মানুষ ছিলেন। সাফল্যের প্রচেষ্টায় তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি ইতিহাসের স্পন্দন অনুভব করতে পারতেন এবং তাঁর অনুকূলে ইতিহাসের ধারাকে প্রবাহিত করতে পেরেছিলেন। সর্বোপরি তাঁর মধ্যে এমন সব গুণের সমন্বয় ঘটেছিল যা অভূতপূর্ব। জন্মসূত্রে তিনি এক কষ্টসহিষ্ণু এবং রণনিপুণ জাতির মানুষ ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার সাহায্যে এইসব গুণের অধিকারী আরব জাতিকে তিনি এক মহান্ সার্বভৌম জাতিরূপে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। মানুষ ভুলে যায় যে মহম্মদ শুধু একজন নবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং এটা ছিল তাঁর নবীত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

২। দ্বিতীয়তঃ নিজস্ব পবিত্রতা ও তাৎপর্য্যকে কেন্দ্র করে পয়গম্বর ইসলাম ধর্মকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই মর্য্যাদা তিনি নিম্নলিখিতভাবে অর্জন করেন।

ক) তিনি নিজেকে সব প্রাণীর জন্য ক্ষমার আধার বলে প্রচার করেন। (প্রফেট্স্-

১০০) এইভাবে সকলের কাছে তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে বিশেষরূপে আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন।

খ) তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর প্রতি আনুগত্যই আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য রূপে স্বীকৃত হবে। এইভাবে তিনি নিজেকে এক বিস্ময়কর দৈবী মর্য্যাদায় ভূষিত করেছিলেন। তাঁর অনুগামীরা অভিভূত হয়েছে যখন জেনেছে যে স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর স্বর্গীয় দূতেরা মহম্মদের কাছে শান্তির জন্য প্রার্থনা করে থাকেন।

গ) তিনি ঘোষণা করলেন যে তিনি মধ্যস্থতা করবার ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁর অনুগামীদের সকলকে স্বর্গে স্থান করে দিতে সমর্থ, যেখানে তারা অক্ষয় আনন্দ এবং শান্তি উপভোগ করতে পারবে। প্রত্যেক মানুষের পরম আকাংক্ষিত বলে এটি পরম আকর্ষণীয় হয়েছিল।

ঘ) **সম্ভবতঃ তিনিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতীয় নেতা। যে ভাবে তিনি সুকৌশলে সংস্কৃতির মাধ্যমে আজমদের (যারা আরব নয়) উপরে আরবদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন, তা শুধুমাত্র অবিশ্বাস্য নয়, অত্যন্ত প্রশংসার্হ এবং তাঁর দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার প্রমাণ।**

ইসলাম মূলতঃ আরবদের জাতীয় আন্দোলন। এ পর্য্যন্ত পয়গম্বরের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে কেউ আলোচনা করেনি। **পয়গম্বরের ঘোষণা যে ঈশ্বর তাঁকে ইসলামে বিশ্বাসীদের কাছে (উস্‌ওয়া-এ-হাস্‌না) "আচরণের আদর্শরূপে" পাঠিয়েছেন এই বার্তা বিশেষরূপে জাতীয় উদ্দীপনার সঞ্চার করে।**

(কনফেডারেটস্‌-২০)

পয়গম্বরকে সর্বক্ষেত্রে আচরণের আদর্শরূপে অনুকরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের কাছে ব্যক্তিগত আচরণের মূল নীতি এবং অবশ্য কর্তব্য রূপে প্রচারিত। পয়গম্বর এই বিষয়টিকে সুকৌশলে আরব জাতীয়তাবাদের স্বার্থে এবং অন্যান্য জাতির মুসলিমদের স্বার্থের পরিপন্থীরূপে ব্যবহার করেছেন।

মহম্মদ যে একজন জাতীয় নেতা ছিলেন এবং আরব জাতিকে সার্বভৌমত্ব দেওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য তার প্রমাণ রয়েছে।

একজন জাতীয়তাবাদী তার জাতি সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে বিবেকদ্বারা চালিত হন এবং গর্ববোধ করে থাকেন। মহম্মদের ক্ষেত্রে এটি সার্বিক সত্য।

১। আবু হুরাইরার বক্তব্য অনুসারে, ঈশ্বর যখন প্রত্যাদেশ দিলেন "তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান কর" তখন পয়গম্বর উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন " হে কুরেশগণ ...."

এর থেকে পয়গম্বরের বংশমর্য্যাদাবোধ পরিলক্ষিত হয়। হাদিস্এ আছে—

ঈশ্বর আব্রাহামের পুত্র ইসমায়েলের সন্ততিদের শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচন করেছিলেন। ইসমায়েলের বংশধরদের মধ্যে থেকে ঈশ্বর কুরেশদের (মহম্মদের উপজাতি) মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচন করেছিলেন, কুরেশদের মধ্য থেকে ঈশ্বর 'বানু হাসিম'দেরকে (মহম্মদের বংশ) মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচন করেছিলেন এবং বানু হাসিমদের মধ্যে ঈশ্বর মহম্মদকে সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত করেছিলেন।

(জে.টি-২য় খণ্ড)

ইহুদীরা নিজেদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত আস্থাশীল অতএব এই হাদিসের অর্থ ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট। অন্য একটি হাদিসেও পয়গম্বর নিজের বংশগৌরব প্রতিষ্ঠা করেছেন। একজন নবী অত্যন্ত কর্তৃত্ব প্রবণ বলে তাঁর একটি তেজস্বী জাতি গোষ্ঠীর একান্ত প্রয়োজন যাদের দ্বারা তাঁর নাম এবং নির্দেশাবলী চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে। এইজন্যই "ইয়াওয়ে" কে সামনে রেখে মোজেস্ ইহুদীজাতির সৃষ্টি করেছিলেন। পয়গম্বর মহম্মদও আল্লাহ্র নাম নিয়ে একই কাজ করেছিলেন। অবশ্যই তাঁর নিজের পরিবার বানু হাসিমদের তিনি শ্রেষ্ঠ ভাবতেন কিন্তু তারা এতো স্বল্প সংখ্যক ছিল যে তাঁর নবীত্বের প্রচারের জন্য তাদের উপর নির্ভর করা যেত না। অতএব মহম্মদ তাঁর নিজস্ব জনগোষ্ঠী কুরেশদের কথা বিশেষরূপে বলেছেন যারা সংখ্যায় গরিষ্ঠ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায় বলিষ্ঠ ছিলেন। মোজেস যেমন ইহুদীদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য নির্বাচন করেছিলেন মহম্মদ সেইরকম কুরেশ জনগোষ্ঠীকে শ্রেষ্ঠত্বেরমর্য্যাদায় ভূষিত করে, কুরেশদের উৎকর্ষের উপরে নিজের ব্যক্তিগত মর্য্যাদার সীলমোহর দিয়েছিলেন।

ক) "আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করুন, যারা কুরেশদের অপমান করতে চায়।"

(জে.টি-২য় খণ্ড)

খ) হে ঈশ্বর তুমি কুরেশদের যন্ত্রণার অনুভব দিয়েছিলে (যখন তারা মহম্মদকে বাধা দিয়েছিল) কিন্তু তাদের এই পৃথিবীর এবং পরজীবনে সব কিছু ভালগুণ আর আশীববর্বাদ প্রদান কর।

(জে.টি- ২য় খণ্ড)

পয়গম্বরের অনুমোদন নিয়ে উথ্‌মান তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যাকারদের বলেছিলেন কোরাণ "কুরেশদের ভাষায়" লিখতে।

(সাহী বখ্ : চতুর্থ খণ্ড)

এর থেকে স্পষ্ট যে কোরাণ কুরেশজাতির ব্যবহৃত আরবী ভাষায় লেখা, অন্য কোনো জনগোষ্ঠীর ভাষায় নয়।

নিম্নলিখিত হাদিস্‌টির যাথার্থ্য অনস্বীকার্য্য। পয়গম্বর এই হদিস্‌টির অনুসরণের ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহ দেখিয়েছেন।

ঘ) শাসনের অধিকার একমাত্র কুরেশদেরই থাকবে, এবং যারাই তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হবে, আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করবেন, যতদিন তারা ধর্মের অনুশাসন মানবে। (সাহী বোখারি : ৪র্থ খণ্ড)

ঙ) শেষ বিচারের দিন পর্য্যন্ত কুরেশরা মানুষের প্রভু, দোষে এবং গুণে (সাহী টার্মজে : ১ম খণ্ড)

সাহী অল্ বুখারির নবম খণ্ডে এই হদিস্‌টির উল্লেখ রয়েছে।

চ) শাসন করার অধিকার (খলিফা হওয়া) যদি ২জন কুরেশও থাকে তাদের হাতেই থাকবে। (সাহী টার্মজে : ৯ম খণ্ড) এই হাদিস্‌গুলির সত্যতা দু'টি ঘটনার দ্বারা সমর্থিত।

১। স্পেনের সুদীর্ঘ আটশতাব্দী ব্যাপী ইসলামতন্ত্রের ইতিহাসে আমরা এমন একজনও সামন্তরাজ পাইনা, যে কুরেশ গোষ্ঠীর নয়। এর কারণ একমাত্র পয়গম্বরের আত্মীয় পরিজনকেই অর্থাৎ কুরেশদেরই, ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় আইনানুগ শাসকরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

২। সাহী আল্‌বুখারীর অষ্টম খণ্ডে এমন একটি ঘটনার সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে, যা একমাত্র কুরেশদেরই শাসনক্ষমতার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে এবং ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য দেয় এবং অন্য সকলকে ঐ মর্য্যাদা দেয় না। এমনকি অত্যন্ত পুণ্যবান এবং সক্ষম আরব মুসলিমরাও আইন অনুসারে শাসন করতে পারে না। এই ঘটনা ইসলামের জাতিগত পক্ষপাতদুষ্ট চরিত্রের উন্মোচন করে এবং জোর গলায় প্রচারিত সাম্য এবং গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ইস্‌লামিক নীতির বিরোধিতা করে।

আরো আশ্চর্য্যের কথা এইযে, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং আফ্রিকার অধিবাসী মুসলমানেরা তাদের জাতিগত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে এবং নিজেদেরকে শুধুমাত্র মুসলিম বলেই দাবী করে থাকে। এটাই হল ইসলামের মধ্য দিয়ে মানসিকভাবে আরব সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। এবং এই জন্যই তাদের নিজস্ব কোনো জাতীয় ইতিহাস গড়ে ওঠে না। ফলতঃ তারা আরব ইতিহাসকে ইসলামিক ইতিহাস বলে আঁকড়ে ধরে এবং তা যতই নিকৃষ্ট হাক্ না কেন, একধরণের অভিন্নতাবোধের সৃষ্টি করে।

মহান্ ওমর কথিত কাহিনীটি সত্য বলে সর্বত্র স্বীকৃত। পয়গম্বরের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের সমস্যাটি তীব্র আকার ধারণ করে। মদিনা নগরীর আনসার, যিনি মহম্মদকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু যিনি কুরেশীয় নন, দাবী করলেন যে তাঁরা যে কোনো আরব জনজোষ্ঠীর সমমর্য্যাদা সম্পন্ন। তাঁরা দাবী করলেন যে দুটি শাসক থাকা উচিত একটি আনসারদের মধ্য থেকে, অপরটি কুরেশদের মধ্য থেকে। আবুবকর খুব রূঢ় ভাবে নবী নির্দেশিত শাসনপ্রণালী থেকে উদ্ধৃত করেছেন—"হে আনসার তোমার সর্বপ্রকার মহৎ গুণাবলীই আছে, যা তুমি দাবী করেছ, কিন্তু শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র কুরেশদেরই আধিকারে থাকবে কারণ তারাই বংশমর্য্যাদায় আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম।"

যখন আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে উঠল তখন ওমর একটি কৌশলের সাহায্য নিলেন। তিনি বললেন "হে আবুবকর তোমার হাত বাড়িয়ে দাও," যখন তিনি তা করলেন, ওমর তাড়াতাড়ি আবুবকরের আনুগত্য স্বীকার করে নিলেন এবং অন্যান্য দেশান্তরী আরবরাও (যারা পয়গম্বরের সাথে মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিল) তাঁকে তাড়াতাড়ি অনুসরণ করলো। এই দেখে আনসার গোষ্ঠী, যারা ছিল ধর্মপ্রাণ মুসলিম, ইসলামের মধ্যে বিভেদের ভয়ে কুরেশদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব মেনে নিল এবং আবুবকরকে খালিফারূপে স্বীকার করে নিল।

এখানে দ্রষ্টব্য এই যে পয়গম্বরের গোষ্ঠীর শাসন করবার অধিকার সংরক্ষিত হয়ে আসছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে পয়গম্বর আগে একজন কুরেশ, তার পরে আরব। অতএব নবী যে জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে তা ইহুদীদের জাতীয়তা বোধের থেকে সঙ্কীর্ণতর কারণ ইহুদীরা সর্বসম্মতভাবে এমন শাসককেও মেনে নিয়েছেন, যিনি ইহুদী নন।

বাইজ্যানটিয়ামের মূর্ত্তি উপাসকরা বা পূর্বদেশীয় রোমানরাও অনেকবেশী আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন ছিল। উপনিবেশগুলির যে কেউ, জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে সম্রাট হতে পারতেন, এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হতেন।

অবশ্যই জাতীয়তাবাদের নানান্ উপাদান আছে, তার মধ্যে জাতি এবং দেশ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জাতিগত বিষয় নিয়ে আলোচনার শেষে নবীর নিজের দেশ আরব সম্বন্ধে কী মনোভাব ছিল, দেখা যাক। আরবদেশ, বিশেষতঃ মক্কা, নিজের জন্মভূমি, সম্বন্ধে নবীর বক্তব্য থেকেই তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়।

১। "যার আরবদেশ সম্বন্ধে আক্রমণাত্মক মনোভাব রয়েছে, সে আমার ভালবাসা পাবেনা এবং আমি তার জন্য মধ্যস্থতা করবো না। (জামে টারম্‌জে ২য় খণ্ড)

২। পারস্য দেশীয় সুলেমান ফার্‌সী, একজন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, যে ইসলামের জন্য লড়াই করে মর্য্যাদা অর্জন করেছিল, তাকে নবী বলেছেন; —"যদি তোমার আরবদেশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকে, তা আমার বিরুদ্ধে ক্ষোভের প্রকাশ বলে গণ্য হবে।' (জে.টি ২য় খণ্ড)

৩। নবী তাঁর নিজের জন্মভূমি মক্কা সম্বন্ধে বলেছেন—"হে মক্কা নগরী, আল্লাহ্‌র নামে শপথ্ নিয়ে বলছি, তুমি পৃথিবীর যে কোনো অংশ অপেক্ষা আমার কাছে শ্রেষ্ঠতর এবং প্রিয়তর"। (জে.টি—২য় খণ্ড)

৪। "মক্কা আমার কাছে যে কোনো জায়গার থেকে শ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়তর। আমার দেশ যদি না আমায় তাড়িয়ে দিত, আমি অন্য কোথাও থাকতাম না।" (জে. টি. - ২য় খণ্ড)

নবীর বক্তব্য এই হাদিস্‌গুলির থেকেও অনেক বেশী তাৎপর্য্য পূর্ণ নবীর কাজগুলি যা মক্কানগরীকে এবং তার সাথে সারা আরবদেশকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী মর্য্যদা এনে দিয়েছে। তিনি জানতেন যে জেরুসালেম নগরী ইহুদী ও ক্রীশ্চানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থানের মর্য্যাদা পেয়েছে। এর কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইহুদীরা এই স্থানটিকে ধর্মীয় মর্য্যাদায় ভূষিত করেছে। **প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য যে কোনো প্রদেশেরই ক্রীশ্চান জেরুসালেমকে আপন জন্মভূমি অপেক্ষাও অধিক মর্য্যাদা এবং বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে থাকে। মক্কা নগরীকে একই ধরণের পবিত্র মর্য্যাদার আসন দিলে মক্কাও পূণ্যস্থানে পরিণত হবে এবং সমগ্র আরবদেশের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করবে।** ডেভিডের কৌশলে জেরুসালেম (ইহুদীদের ঈশ্বর) "ইয়াওয়ে"র দেশে পরিণত হল এবং সলোমান যখন সেখানে

একটি মন্দির নির্মাণ করলেন, তখন ইহুদীদের কাছে এটি পবিত্রতম স্থানের মর্য্যাদা পেল এবং খৃষ্টের জন্ম, এর খ্যাতি ও মর্য্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল।

নিজেদের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও ইহুদীরা বরাবরই অত্যন্ত সংগঠিত গোষ্ঠী ছিল। নিজেদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল এবং ধনতন্ত্রে বিশ্বাস তাদের ব্যবসায়িক মনোভাবপন্ন করে তুলেছিল। অতএব তারা যেখানেই বাস করতো, সেখানেই সামাজিক মর্য্যাদা পেত। আরব উপদ্বীপেও তারা সমমর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। যেহেতু ইহুদী ও আরব দুই গোষ্ঠীরই অভিন্ন পূর্বপুরুষ ছিলেন আব্রাহাম অতএব তাদের অনেক কিছুই অভিন্ন ছিল, যদি তাদের উভয়ের প্রাচীন সেমিটিক উদ্ভবের কথা বাদও দেওয়া যায়। নবীতন্ত্রের প্রথম দিকে নবী অনেক চেষ্টা করেছিলেন, ইহুদীদের তাঁর মত ও পথে নিয়ে আসার জন্য। তিনি জেরুসালেমকে "কিব্‌লা" দিয়েছিলেন, যে দিকে তাকিয়ে মুসলিমরা প্রার্থনা করবে। এইভাবে ইহুদীদের অত্যন্ত সম্মান দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া কোরাণে বারবার বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ ইহুদীদের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা দিয়েছেন। কিন্তু এইসব মানিয়ে নেবার প্রচেষ্টা ইহুদীদের উপর বিরুদ্ধ প্রভাব ফেলেছিল এবং তারা কুরেশদের সাথে মিলিত হয়ে নবীর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল। বিজয়ী হয়ে নবী তাদের ঘৃণা ও অবজ্ঞা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর আত্মীয় পরিজন কুরেশদের ক্ষমা করেছিলেন। **এমন অনেক প্রমাণ আছে, যা থেকে বোঝা যায় যে নবী আরবজাতিকে ইহুদী, বাইজ্যানটাইন, ইরাণী এবং তুর্কীদের অপেক্ষা অনেক উন্নত করে তুলতে চেয়েছিলেন**। তাঁর বাণী আপাত দৃষ্টিতে বিশ্বজনীন হলেও প্রকৃতপক্ষে তা জাতীয়তাবাদী। 'ইটারনিটি' বইটিতে ইসলামের এই দিক্‌টি উপেক্ষিত রয়ে গেছে।

নবী যে একটি সার্বভৌম আরব জাতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর নিজেরই বক্তব্যে পাওয়া যায়।

১। নবী বলেছিলেন যে আমার অনুগামী যে প্রথম দলটি সীজারের দেশ কনস্তান্তিনোপ্‌ল আক্রমণ করবে, তাদের সব পাপ ক্ষমা করা হবে এবং পুরস্কার স্বরূপ তারা স্বর্গলাভ করবে।

(আল্ বোখারি ৪র্থ খণ্ড)

এখানে অনুগামী বলতে আরবদের বোঝায় কারণ সেই সময়ে শুধুমাত্র আরবরাই তাঁর অনুগামী ছিল।

২। নবী বলেছেন সেই সময় আসবে যখন আরবরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে, যাদের চোখ ছোট, মুখ লাল্, নাক চ্যাপ্টা, এবং যারা লোমের তৈরী জুতো পরে।

(আল্ বোখারি ৪র্থ খণ্ড)

৩। নবী বলেছেন যে পারস্যের সম্রাট খুসরু, ধবংস হয়ে যাবে এবং আর কোনো সীজার তার বংশধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না এবং তোমরা, আরবরা, আল্লাহ্র জন্য তোমাদের ধনসম্পদ ব্যয় করবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন "যুদ্ধ একটা প্রবঞ্চনা"।

(আল্ বোখারি ৪র্থ খণ্ড)

৪। নবী চাইতেন যে তাঁর অনুগামীরা ইহুদী এবং ক্রীশ্চানদের থেকে সংস্কৃতিগত ভাবে পৃথক হবে এবং তাদের দেখতেও যেন অন্য ধরণের হয়। নবী বলেছেন "ইহুদীরা এবং ক্রীশ্চানরা তাদের (সাদা) চুলে কলপ দেয় না, অতএব ওরা যা করবে, তোমরা তার উল্টোটা করবে।"

(সাহী অল্‌বোখারি ৭ম খণ্ড) মুসলিমদের মধ্যে চুল ও দাড়ি রঙ করার প্রথা, নবীর আদেশ মতো প্রচলিত হয়ে আসছে।

৫। নবী চাইতেন না যে, আরবরা, যারা আরব নয়, তাদের মতো সাজ পোষাক করবে।

যখন নবী আবদুল্লা প্রভৃতিকে গৈরিক বর্ণে রঞ্জিত পোষাক পরতে দেখেন, তখন তিনি তাদের এরকম পোষাক পরতে বারণ করেন, এই কারণে যে এরকম পোষাক কাফেররা পরে থাকে।

(সাহী মুসলিম-৩য় খণ্ড)

এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষণীয়। হলুদ এবং গৈরিক রং হিন্দু এবং বৌদ্ধ সাধুদের বৈশিষ্ট্য ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম, আরব এবং ইরাণে প্রসার লাভ করেছিল।

নবীর নিজের জাতি সম্বন্ধে মনোভাব ইহুদিদের প্রতি তাঁর আচরণে সুস্পষ্ট রূপে বোঝা যায়।

ক) ইহুদীদের ধর্মপুস্তকের ভাষা হিব্রুর প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবার জন্য কোরাণ নির্দেশ দিল যে মুসলিমরা ইহুদী এবং ক্রীশ্চানদের ধর্মপুস্তকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনোটাই করবে না কিন্তু একমাত্র কোরাণেই বিশ্বাস রাখবে (যা আরবী ভাষায় লেখা)।

[সূরা যুখ্‌রোফ্ ঃ ২-৩] "সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ, আমি এ অবতীর্ন করেছি কোরাণরূপে, আরবী ভাষায় যাতে তোমরা বুঝতে পার।"

এই পংক্তিগুলি দুটি জিনিষ বোঝায়।

১। কোরাণ আরবদের জন্য, এটি আরবী ভাষায় রচিত। যেহেতু এটি অন্য কোনো ভাষায় লিখিত নয়, অতএব যারা আরব নয় তারা বুঝুক না বুঝুক কিছু যায় আসে না।

২। যেহেতু কোরাণ আরবী ভাষায় লেখা, সে হেতু অবশ্যই এটি আরবদের পছন্দসই ভাষা।

খ) ইহুদীরা প্রথাগত ভাবে হিব্রুতে লেখা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' পড়ত এবং আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করতো। আরবীকে ধর্মীয় ভাষায় উন্নীত করে নবী চেয়েছিলেন যে আরবরা হিব্রুকে গুরুত্ব না দিয়ে আরবীকে তাদের জাতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করুক।

গ) ইহুদীরা নবীকে না মেনে নেওয়ায়, তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর মনোভাবাপন্ন হয়েছিলেন।

১। তিনি জেরুসালেমকে ছেড়ে কিব্‌লার জন্য 'কাবা'র দিকে নির্দেশ করলেন। মহম্মদের জন্মস্থান মক্কার বিশাল মসজিদের কেন্দ্রে অবস্থিত ছোট উপাসনা গৃহটির নাম 'কাবা'। মহম্মদকে খুশী করবার জন্যই আল্লাহ্ এই পরিবর্তন এনেছিলেন। পরবর্তী আয়াত থেকে এটাই বোঝা যায়।

[সূরা বাকারাহ্ ঃ ১৪৪] " তোমাদের আকাশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাতে দেখেছি;এখন নিশ্চি তভাবেই তোমাদের মুখ ঘুরিয়ে দেব কাবার পবিত্র মসজিদের দিকে; তোমরা যেখানেই থাকো, ঐ দিকেই মুখ করবে।"

এই পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল আত্মমর্য্যাদারনীতির উপর ভিত্তি করে আরব জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা। যাতে আরবরা মনে করতে পারে যে তারা মর্য্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক নির্বাচিত এবং বিশ্বব্যাপী অন্যান্য জাতির মুসলিম, যারা আরব নয়, তারাও আল্লাহ্‌র নির্দেশ মনে করে আরব জাতীয়তাবাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে নতি স্বীকার করবে। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় যখন সারা পৃথিবীতে যত মুসলিম আছে, তারা সবাই দিনে পাঁচবার মক্কার 'কাবা' অভিমুখে প্রার্থনায় সাষ্টাঙ্গে নত হয়। তারা তাদের মৃতকে মক্কার দিকে মুখ করে গোর দেয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ,

প্রতিটি মুসলিমের আর্থিক সঙ্গতি থাকলে, জীবনে একবার অন্ততঃ 'হজ' করা বাধ্যতা মূলক। মুসলিমদের যে কোনো উপাসনা স্থলই ধর্মীয় মর্য্যাদায় কাবা অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

পৃথিবীর অন্য কোনো (ধর্মীয়) স্থান মানুষের কাছে, 'কাবা'র মতো এতোখানি মর্য্যাদা পায়নি। "কাবা"র প্রতি শ্রদ্ধার অর্থ মক্কার প্রতি শ্রদ্ধা, মক্কার প্রতি শ্রদ্ধা মানে আরবদেশের প্রতি শ্রদ্ধা, তার মানে আরবদের (জাতির) প্রতি শ্রদ্ধা, যারা আরব দেশের অধিবাসী।

মুসলিমরা বলে যে নবী বাইতউল্ মুকদ্দাসকে (জেরুসালেম) কিব্লার মর্য্যাদা দিয়েছিলেন্ এই জন্য যে সেই সময় 'কাবা', মন্দিরের মতো নানান্ মূর্ত্তিতে পূর্ণ ছিল, যা আল্লাহ্ ঘৃণা করেন। ইতিহাস কিন্তু এই তথ্যের বিরোধী। 'কিব্লা'র পরিবর্তন হয় ৬২৪ খৃষ্টাব্দে এবং তখন পর্য্যন্ত 'কাবা' কুরেশদের পবিত্র উপসানাস্থল ছিল, যেখানে তারা আল্লাহ্র এবং অন্যান্য মূর্ত্তির পূজা করতো। ৬৩০ খৃষ্টাব্দে নবী বিজয়ীর বেশে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং 'কাবা' থেকে সমস্ত মূর্ত্তি অপসারিত করেন।

কোরাণ অনুযায়ী আল্লাহ্ মুর্ত্তি পূজা ঘৃণা করেন, যা একমাত্র ক্ষমার অযোগ্য পাপ; তবুও আল্লাহ্ যিনি সর্বশক্তিমান্ 'কাবা'য় মূর্ত্তিপূজা চলতে দিয়েছিলেন এবং প্রায় হাজার বছর ব্যাপী এই প্রথার অবসান ঘটাতে পারেননি, এবং তাঁকে মহম্মদের আবির্ভাব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল এই ঘৃণিতপ্রথার অবসানের জন্য। অতএব সহজেই বোঝা যায় যে 'আল্লাহ্' সত্য নন, কেবলমাত্র আরবদেশকে শক্তিশালী করার সপক্ষে একটি মানসিক মাধ্যম। অতএব আশ্চর্য্য নয় যে আল্লাহ্ আরবী ভাষায় কথা বলেন এবং আরবী ভাষাভাষীদের জন্য আরবী ভাষায় কোরাণ প্রেরণ করেন।

(ঘ) আরবরা বরাবরই জানতো যে আব্রাহাম তাদের এবং ইহুদীদের উভয়েরই পূর্বপুরুষ ছিলেন, কিন্তু বাইবেলে ইহুদীদের আরবদের থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ বাইবেল অনুসারে ইহুদীরা আইজ্যাকের বংশজ, যিনি আব্রাহামের আইনসম্মত পত্নী 'সারা'র গর্ভজাত আর ইসমায়েল যদিও আব্রাহামের ঔরসজাত কিন্তু তার জন্ম আব্রাহামের স্ত্রী সারার মিশরীয় দাসী 'হাগার' এর গর্ভে।

বাইবেল অনুসারে ঈশ্বর আইজ্যাকের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, ইসমায়েলের সাথে নয়, কিন্তু নবী অবস্থাটিকে উলটে নিয়েছিলেন কারণ কোরাণ দাবী করে যে—

১। আব্রাহামই ইসমায়েলের সাথে 'কাবা'র ভিত্তি স্থাপনা করেন, যা প্রভুর আলয়।

২। এখানেই আব্রাহাম এবং ইসমায়েল প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন তাদের বীজ থেকে এক জাতির সৃষ্টি করেন যারা তাঁর (প্রভুর) অনুগত হবে। এবং

৩। প্রভু যেন তাদের মধ্যে থেকে একজন দূত মহম্মদকে পাঠান যিনি তাঁর সঙ্কেত আবৃত্তি করবেন এবং তাদের বইটি (কোরাণ) শেখাবেন। (দ্য কাউ ১২০)

উদ্দেশ্য পরিষ্কার, দৈবী বৈশিষ্ট্য ইহুদীদের থেকে নিয়ে আরবদের দিয়ে দেওয়া। যদি একে জাতীয়তাবাদ না বলা হয় তবে এটা কী? সততার দাবী—সত্য সম্পূর্ণ উদঘাটিত হোক্।

ইতিহাসে এমন কোনো প্রমাণ নেই যে আব্রাহাম কখনো মক্কায় গিয়েছিলেন। বাইবেলের তথ্য এবং পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী আব্রাহাম সুমেরিয় নগরী 'উর্ কাস্‌দিম্' এর অধিবাসী ছিলেন। অধুনা তাল্-অল্-মুকাইয়ার্ (বা মুঘায়ির) 'যা বাগ্‌দাদের ২০০ মাইল দক্ষিণ পূর্বে নিম্ন মেসোপটেমিয়ায় অবস্থিত। উর্ ত্যাগ করে আব্রাহাম প্রথমে 'হারান' এ কিছুদিন থাকেন, তারপর পবিত্র নগরী বেথেল্ এ আসেন যেখানে ক্যানানাইট দেবতা 'এল্' এর আধিপত্য ছিল। 'জেনেসিস্' অনুসারে এখানেই আব্রাহাম এক বেদিকা নির্মাণ করেন এবং পবিত্র ক্যানানাইট স্থানটি অধিগ্রহণ করে 'ইয়াওয়ে'কে উৎসর্গ করেন। যখন তিনি "হেব্‌রন" এর অন্তর্গত "মামরে"তে উপস্থিত হ'ন, তখন তিনি তাঁর জাতির চিরস্থায়িত্ব সম্বন্ধে আশ্বাস এবং প্রত্যাদেশ লাভ করেন। এখানেই তাঁর যাত্রা শেষ হয়, অতএব তাঁর যাত্রার সমাপ্তি ঘটে ক্যানানাইট ভূমিতে, মক্কায় নয়।

এছাড়া, পণ্ডিতেরা দাবী করেন যে আব্রাহাম একেশ্বরবাদী বা এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি বহুর মধ্যে একটি দেবতার উপাসনা করতেন। কথিত আছে যে তিনি "সর্বোচ্চ দেবতার" নামে শপথ নিতেন, যাঁরা হলেন 'ইয়াওয়ে' এবং "এল্ এলিয়ন" উভয়েই। এই 'এল্'ই পরে মক্কায় "আল্লাহ্" নামে পরিচিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মূর্ত্তি বহু শতাব্দী ধরে কাবায় পূজা পেয়েছে। এখানে দুটি সেমিটিক শাখার মধ্যে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়। বহু শতাব্দী ধরে এই বিবাদ চলে আসছে এবং এখনও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়নি, বরং তা বেড়েই চলেছে। আরবদেশের মর্য্যাদা বাড়ানোর জন্য নবী আপন জন্মস্থান মক্কাকে অসাধারণ পবিত্রতায় ভূষিত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কোরাণ বলে :—

(২৭:৯১) "হে নবী! ওদের বলো যে আমি কেবল মক্কার অধিষ্ঠাতা আল্লাহ্‌র

আরাধনা করতে অদিষ্ট হয়েছি।"

এটি আল্লাহ্‌র সাথে মক্কার বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস। তিনি সর্বপ্রথমে মক্কার প্রভু, পরে বাকি পৃথিবীর। মহম্মদের জন্মস্থান মক্কাতেই আল্লাহ্ বাস করেন।

২। (১৪:৩৫-৩৭) এখানে আব্রাহাম কর্তৃক মক্কাকে শান্তিপূর্ণ এবং সুরক্ষিত করবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাতে দেখা যায়। তিনি 'কাবা'কে আল্লাহ্‌র পবিত্র বাসস্থান বলে ঘোষণা করেছেন।

৩। ৫:৯৭, এখানে আল্লাহ 'কাবা'কে পবিত্র বাসস্থান, সুরক্ষিত আশ্রয় এবং মানব জাতির তীর্থস্থান ঘোষণা করেছেন।

কোরাণ আরো একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে যে আব্রাহাম, ইহুদী বা ক্রীশ্চান কোনোটাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুসলিম, (হাউস্ অফ্ ইমরান - : ৬০) আরো এক জায়গায় কোরাণ বলে যে আব্রাহামের ধর্ম ছিল ইসলাম এবং তিনি "তোমাদের 'মুসলিম' নাম দিয়েছেন" (দ্য পিল্‌গ্রিম : ৭৫)

সমস্ত মুসলিমদের কাছে আরবদেশকে শ্রদ্ধা ভক্তির কেন্দ্রস্থল করে তোলার জন্য কোরাণে (হাউস্ অফ্ ইমরান্ :৯০) নির্দেশ আছে যে, সকল মুসলিমের, অর্থবল থাকলে, জীবনে একবার অন্ততঃ মক্কায় যাওয়া বাধ্যতামূলক। একে 'হজ' বলা হয় এবং এটি ইসলাম ধর্মের অন্যতম মূলনীতি এবং স্বর্গলাভের চাবিকাঠি। যারা এই নির্দেশ লঙ্ঘন করে তারা আল্লাহ্‌র চোখে সত্যিকারের মুসলিম নয় এবং তিনি তাদের যথার্থ বিশ্বাসীর জন্য সংরক্ষিত উপহার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন।

সেই সময় মক্কা ছিল একটি বড় গ্রাম মাত্র। তবু "আরবী কোরাণ" একে "সকল নগরীর মাতা" বলে ঘোষণা করেছিল যাতে মক্কা পৃথিবীর সব নগরীর থেকে উচ্চ মর্য্যাদাসম্পন্ন হয়। (কাউন্সিল :৫)

কোনো জাতীয় নেতাই কখনো এমন জাতীয়তাবোধ সম্পন্ন কাজ করতে পারেনি। আরব দেশে এর সুফল একটি ঘটনার মধ্য দিয়েই সুস্পষ্ট। অধুনা প্রতি বছরে মক্কা অন্ততঃ ২ লক্ষ তীর্থ যাত্রী আকর্ষণ করে। যদি প্রতিটি তীর্থযাত্রী ৩ হাজার পাউণ্ড স্টারলিং খরচ করে, তবে আরবদেশ বছরে ৬ শো কোটি পাউণ্ড আয় করবে। সৌদি আরবের জনসংখ্যা ৬০ লক্ষ বলে ধরা হয়। তবে হিসেব করলে মহিলা এবং বাচ্চা সমেত প্রতিটি লোকের বার্ষিক আয় এক হাজার পাউণ্ড কিংবা প্রতিটি পরিবারের আয় পাঁচ হাজার পাউণ্ড যা গ্রেট ব্রিটেন বা অন্য অনেক ইউরোপীয় দেশের সমান

আয়তনের পরিবারের বার্ষিক আয়ের থেকে অনেক বেশী। তৈলসম্পদ আবিষ্কারের আগে আরবীয়রা 'হজ' এর আয়ের উপর প্রধানত ঃ নির্ভরশীল ছিল। এর থেকেই নবীর স্বাজাত্য বোধের বিশালতার পরিমাপ করা যায়, এর সাথে আন্তর্জাতিক মর্য্যাদা এবং আরবদেশের পবিত্রতার প্রতি বিশ্বাস উপরি পাওনা থেকে যায়। প্রতিদিন পৃথিবীব্যাপী লক্ষ কোটি মানুষ মক্কা অভিমুখে প্রার্থনায় নত হয় এবং স্বর্গীয় কৃপা ভিক্ষা করে থাকে। এ এক চমৎকার, যা বছরে বা মাসে, একদিন নয়, প্রতিদিন পাঁচবার করে হয়ে থাকে। এর মধ্যেই নিহিত আছে মহম্মদের জাতীয় গুরুত্ব, তাঁর দূরদর্শিতা, তাঁর প্রজ্ঞা এবং চারি ত্রিকমহত্ত্ব। কতো বড়ো জাতীয়তাবাদী ছিলেন নবী। তাঁর দেশপ্রেমের সাথে আর কারোর তুলনা করা যায় না।

নবী, তাঁর দেশ ও জাতিকে প্রত্যাদেশের প্রভাবে পবিত্র ঘোষণা করেছিলেন। তিনি জানতেন যে তাঁর দেশের লোকেরা কোনোদিন পৃথিবীকে শাসন করতে পারবে না, যতদিন না তারা এক কার্য্যকরী সামরিক শক্তিতে পরিণত হয়। সেই জন্য তিনি জেহাদ এর নীতি প্রণয়ন করলেন অর্থাৎ ইসলামধর্মের বিরোধীদের সাথে যুদ্ধ করা, তাদের দেশ, সম্পদ্ এবং নারীদের কেড়ে নেওয়া এবং তাদেরকে আরবদের সার্বভৌম ক্ষমতার কাছে নত করা। এইভাবে জেহাদের নীতি কাজ করে ঃ—

১। তিনি ইহুদীদের বললেন, "যদি তোমরা মুসলিম হও, তোমাদের রক্ষা করা হবে, অন্যথা, তোমাদের জানা উচিত যে এই পৃথিবী 'আল্লাহ্‌র এবং তাঁর দূত মহম্মদের এবং আমি তোমাদের এই ভূমি থেকে নির্বাসিত করতে চাই।" (সাহী আলবুখারি ৪র্থ খণ্ড)

২। যেহেতু সমগ্র পৃথিবী বা অধিকাংশ পৃথিবী অধিকারের উচ্চাশা পূরণের জন্য সামরিক অভিযানের প্রয়োজন আছে, তাই নবী ঘোষণা করলেন, "স্বর্গ তরবারির ছায়ায় বিরাজ করে।"

(সাহী আল্‌বুখারি; ৪র্থ খণ্ড)

অনুগামীদের দৈব প্রেরিত যোদ্ধার মর্য্যাদা দেবার জন্য কোরাণ ঘোষণা করলো ঃ—

(সূরা তওবা ঃ ১১১) "নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসীদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ বেহেশতের মূল্য বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে, (অসৎ ব্যক্তিদের) নিহত করে অথবা (নিজেরা) নিহত হয়।"

স্বর্গ এক প্রাচুর্য্যময় প্রদেশ। সুন্দরী নারী এবং সুকুমার বালকে পূর্ণ। মুসলিম যোদ্ধা বিজয়ী হলে, মর্ত্যেই সে স্বর্গসুখ লাভ করে অপহৃত সম্পদ ও নারীর মাধ্যমে। যুদ্ধে মৃত হলে সে সোজা স্বর্গলাভ করে। অতএব তার ক্ষতি হয় না। হত্যা, লুণ্ঠন ও সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে কী দার্শনিক প্রলোভন!

৪। যেহেতু 'জেহাদ' অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে, সেহেতু নবী অসংখ্য ধর্মযুদ্ধের সুযোগ সৃস্টি করেছিলেন অন্য সব ধর্মকে মিথ্যা, নাস্তিক এবং দেবতার বিরুদ্ধাচারণ অপবাদ দিয়ে।

(সূরা আল্-ই-ইমরান : ৮৫) "এবং কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইলে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত।"

৫। নবী অন্য সব ধর্ম বাতিল করে দিয়েছিলেন কারণ তিনি নিজেকে সমগ্র মানবজাতির পরিত্রাতা বলে ঘোষণা করেছিলেন।

"যে কোনো ইহুদী বা ক্রীশ্চান, যে আমার কথা শুনেছে, কিন্তু আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে না, অবশ্যই নরকগামী হবে।

(সাহী মুসলিম)

৬। নবী ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মানুষের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের জন্য আদেশ পেয়েছেন, যতদিন না তারা স্বীকার করে নেয় যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো দেবতা নেই এবং মহম্মদ তাঁর দূত (নবী)। তিনি মানুষের জীবন ও ধনসম্পদ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন একমাত্র এই শর্তে। (সাহী মুসলিম; অনুচ্ছেদ ৯)

সত্যি বলতে কী, এইসব ধর্মযুদ্ধগুলি ছিল জাতীয় উচ্চাশা পূরণের জন্য এবং বিধর্মীদের যুদ্ধের মতোই নৃশংস ছিল। নবী নিজেই বলেছেন "যুদ্ধ একটা প্রবঞ্চনা" এবং একথাই ঠিক। অতএব এর ফল নবীর দাবী অনুযায়ী "সকল প্রাণীর প্রতি কৃপা" এখানে প্রযোজ্য হতে পারে না। আল্ বুখারি অষ্টম খণ্ডে এই প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন তার তিনটি উদ্ধৃত করা যাক—

১। নবী "উরেইনা" জাতির পুরুষদের হাত ও পা কেটে ফেলে রেখে দিলেন এবং রক্তপাতের জন্য তাদের মৃত্যু হল।

২। যখন উকূল এর অধিবাসীরা অপরাধ করল তখন নবী তাদের গ্রেপ্তার করালেন।

তাদের হাত এবং পা কেটে ফেলা হল। তাদের চোখে উত্তপ্ত লাল, লৌহ শলাকা বিদ্ধ করা হল এবং তাদের অল্ হাররা'তে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হ'ল। যখন তারা পানীয় জল চাইল, তাদের তা দেওয়া হ'ল না এবং তৃষ্ণায় তাদের মৃত্যু হ'ল।

৩। যারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল, তিনি তাদের অঙ্গহীন করে দিয়েছিলেন এবং রক্তপাতে তাদের মৃত্যু হয়েছিল। নবীর আচরণ কোরাণের দ্বারা সমর্থিত।

আল্লাহ্ এবং তাঁর দূতের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ করে তাদের একমাত্র পুরস্কার হল হত্যা, ক্রুশবিদ্ধ করা, কিংবা বিপরীত দিক থেকে হাত এবং পা কেটে ফেলা অথবা দেশ থেকে নির্বাসন। (দ্য টেব্‌ল : ৩৩)

এ থেকে বোঝা যায় যে ইসলাম ক্ষমার বাণী নয়, এ হ'ল অন্যান্য সমকালীন বিধির মতো ধর্মনিরপেক্ষ বিধি। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে চিরায়ত করবার জন্য এবং মুজাহিদিনদের (আল্লাহ্‌র সৈনিক) যুদ্ধকালীন প্রস্তুতির মধ্যে রেখে দেবার জন্য, অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণার ভিত্তিতে ইসলামের অবস্থান। নিম্নলিখিতগুলি পরীক্ষা করা যাক ঃ—

১। মৃত মা, বাবা, আত্মীয় কিংবা বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা কোরো না, তাদের সমাধিস্থলে যেওনা, যদি তারা অমুসলিম হয়।

(রিপেনটেন্‌স সূরা তওবা-১৮৯)

২। যারা বিশ্বাসী তারা যেন অবিশ্বাসীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।

(দ্য ওমান টেস্‌টেড : ১০)

৩। মুসলিমরা অবশ্যই অমুসলিমদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাবে এবং তাদের প্রতি কঠোর হবে।

(দ্য ফরবিডিং -৫)

৪। মূর্ত্তি পূজকদের যেখানে পাবে, সেখানেই হত্যা করবে।

(রিপেন্‌টেন্‌স সূরা তওবা -৫)

৫। যেখানেই পাবে সেখানেই অবিশ্বাসীদের হত্যা করবে। তাদের কারোকে বন্ধু বা সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবে না।

(উইমেন সূরা নিসা -৯০)

৬। আল্লা পয়গম্বরকে অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর হতে বলেছেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন যে তারা বেশী দিন তাঁকে বাধা দিতে পারবে না। (দ্য কন্‌ফেডারেটস

সূরা আহ্যাব ৬০)

৭। আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য অগ্নিদাহ—প্রস্তুত করেছেন। (দ্য কনফেডারেটস-৬৫) সহজেই বোঝা যায় যে, যেমন কার্ল মার্কস এক নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যার ভিত্তি হবে সামাজিক ক্ষয় বা ধ্বংস, এবং যেখানে দরিদ্র শ্রমজীবি মানুষের জয় অনিবার্য্য, সেইরকম নবী ও এক সমাজ বা পৃথিবী গড়তে চেয়েছিলেন, যেখানে দৈব প্রণোদিত সংঘর্ষের সাহায্যে এবং আরবদের নেতৃত্বে তাঁর অনুগামীরা উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে।

অবশ্যই কোরাণে এমন অনেক পংক্তি আছে যা জাতীয়তাবাদের ঈঙ্গিত বহন করে, কিন্তু তাদের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুসলিমরা বুঝতে পারেনি যে মহম্মদের জীবদ্দশায় ইসলাম আরবদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। অতএব যখনই কোরাণ পাঠককে বা দর্শককে সম্বোধন করে "জনগণ", "বিশ্বাসীরা" বা "অনুগতরা" বলে, তা আরবদের উদ্দেশ্য করেই বলে থাকে। বস্তুতঃ কোরাণ, যা জোরগলায় নিজেকে "আরবী কোরাণ" বলে থাকে, যাতে আরবরা অবশ্যই কোরাণের বাণীর অর্থ উপলব্ধি করতে পারে, সুস্পষ্ট ভাবেই ইসলামের জাতীয় সত্তাকে ব্যাখ্যা করে।

জাতিত্ব একটি স্বাভাবিক সামাজিক পরিমাপ যা ধর্ম, ন্যায়নীতি বা সততারও মাপকাঠি। একটি মানব ও মানবীর মিলনে জন্ম নেয় মানবশিশু, তারা সংখ্যায় বাড়তে বাড়তে দল, গোষ্ঠী ও জাতিতে পরিণত হয়ে একটি বিশেষ ভূমিখণ্ডে বসবাস করতে থাকে। তাদের বন্ধন শুধুমাত্র রক্তের সম্বন্ধে নয়। তারা এক ভাষা, একই আচার আচরণ, একই ঐতিহ্যে, একই পূর্বপুরুষের সূত্রে গাঁথা। এছাড়া তাদের বাসভূমিও তাদের ভাগ্য নির্দ্ধারণে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে, সে কেবল জন্মভূমি বলে নয়, নিজের দেশকে বিদেশী লুণ্ঠণকারীদের আক্রমণ থেকে বাঁচানোর উপর তাদের সম্মান নির্ভর করে। দেশবাসীর এই জাতীয় ঐক্যবোধই এক সর্বজনীন অধিকারবোধের জন্ম দেয় যা বিভিন্ন মাত্রায় দেশবাসীর মনে অনুভূত হয় এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ করে। অবশ্যই ধর্ম বা সামাজিক মতবাদ, যেমন সমাজবাদও জাতির ইতিহাসে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে কিন্তু তা গৌণ। ধর্ম এক অন্ধশক্তিকে চালিত করে যার প্রভাব ক্রমশঃই দুর্বল হয়, যতই মানুষ বুদ্ধিমান ও যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। আবার জাতীয় স্বার্থ সবসময় ধর্মীয় স্বার্থের ঊর্দ্ধে থাকে, যদি না দেশ একদল বিশ্বাসঘাতক বা ধর্মোন্মাদ দ্বারা পরিচালিত হয়। এমনকি আরবরাও বহু জাতিতে বিভক্ত, প্রত্যেকে নিজের নিজের স্বার্থ দেখে। কিছুদিন আগেকার 'উপসাগরীয় যুদ্ধ' এই সত্য প্রমাণ করেছে।

যথার্থই জাতীয় মর্য্যাদাবোধ এবং মহান জাতিতে পরিণত হবার উচ্চাকাংক্ষাই নীতি বা মূল্যবোধের আধার। মহান্ দেশ বা জাতির মহান নীতি ও ঐতিহ্য এবং উচ্চস্তরের মূল্যবোধ থাকে কিন্তু কিছু দেশ বা জাতি যেমন ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ, জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস রাখে না এবং সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে থাকে। এটাই তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সততার ধ্বংস ডেকে আনে। পাকিস্তানের সৃষ্টিই প্রমাণ করে যে জাতিবাদ এক পরম সত্য, শুধুমাত্র ভাবপ্রবণতার ফসল নয়। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে এই রাষ্ট্রের জন্ম, কিন্তু ১৯৭১ সালে, অনেক রক্তপাতের মধ্য দিয়ে এর পূর্বভাগ, জাতিগত কারণে পৃথক্ হয়ে বেরিয়ে আসে। বাকি চারটি প্রদেশ একই কারণে সারাক্ষণ বিবাদে লিপ্ত। যেহেতু এখানে কোনো জাতিগত মর্য্যাদাবোধ নেই, এদেশের মানুষের জাতিগত সত্তা যে কোনো মুহূর্ত্তে শেষ হয়ে যেতে পারে।

যাইহোক্ ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদ জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ। একধরণের ভয়ঙ্কর মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ, কারণ দেশ বা জাতি মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং সেইজন্য মানুষের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরদায়ী। কোনো জাতিই অন্য কোনো জাতি অপেক্ষা সহজাত গুণে মহত্তর নয়, কারণ তাদের একই উৎপত্তিস্থল। একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব তার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরাক্রম দ্বারা স্থিরীকৃত হয়না, হয় মানবজাতির সেবার মধ্য দিয়ে, তাই প্রতিটি পরাক্রান্ত জাতির পক্ষে দুর্বলতর জাতিকে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য। একটি যথার্থ সভ্য জাতি বিদ্বেষকে ঘৃণা করে, কারণ এহ'ল মানুষের হীন প্রবৃত্তির প্রকাশ। এই জন্য সংস্কৃতিগত সভ্যতা, জাতীয়তাবোধের অঙ্গ। এর অর্থ একটি সভ্যজাতি তার বিদেশী দরিদ্র সদস্যদের মানবিক কারণে স্বাগত জানায় এবং জাতি ভেদ না করে তাদের বন্ধুভাবে গ্রহণ করে। গ্রেট ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি এবং ফ্রান্স এই জাতীয়তাবাদী আত্মীয়করণের উদাহরণ। এটি বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে মানবিক সূত্র, যা অন্যান্য অনেক বিষয়ের উর্দ্ধে, কিন্তু স্থানীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বত্র ইচ্ছামতো আরোপ করা যায় না।

নবীর জাতীয়তাবাদ ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত। একজন মুসলিম আরবদের মতো কিছু সুবিধা ভোগ করে, কিন্তু তবু সে আরবদের প্রজা, কারণ শাসনতন্ত্র, আরবদের, বিশেষত কুরেশদের অধিকারে।

নবী নিজের ব্যক্তিগত পবিত্রতাকে ইসলামধর্মের মূল স্তম্ভ রূপে নিয়োজিত

করেছিলেন। যথা নবীকে বিশ্বাস না করে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা আর না করা একই ব্যাপার। **নবী নিজেকে, আচরণগত দৃষ্টান্ত স্বরূপ (উসওয়া-এহাস্না) উপস্থাপনা করেছেন। এই কারণে মুসলিমদের কাছে, তা সে যে কোনো প্রদেশেরই হোক্ না কেন, বহু শতাব্দীব্যাপী, এটি আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ স্বরূপ স্বীকৃতি পেয়ে আসছে।**

এটি ভালভাবে বোঝা দরকার যে নবী একজন আরব যিনি আরব সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। অতএব তিনি আরব সতীর্থদের মতো জীবনযাপন করতেন। প্রথমদিকে তাঁর এবং অন্যান্য আরবদের মধ্যে ধর্মই একমাত্র প্রভেদ ছিল। একবার যখন তারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করল, তখন আর কোনো সংস্কৃতিগত পার্থক্য রইল না। তারা সবাই আরবী ভাষায় কথা বলতো, একই ধরণের পোষাক পরতো, একই ধরণের খাবার খেতো, একই ধরণের আচার আচরণ ও ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল, একই শীত ও গ্রীষ্ম উপভোগ করতো এবং তাদের একই ইতিহাস ও মানসিকতা ছিল এবং তারা একই ধরণের জাতীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। **যেহেতু কেউই নবীর অনুমতি ছাড়া স্বর্গে প্রবেশ করতে পারতো না এবং নবী একমাত্র তাঁর অনুগামীদের জন্যই মধ্যস্থতা করতেন, অতএব ইসলামে বিশ্বাসীদের পক্ষে নবীর আচরণমূলক 'দৃষ্টান্ত' পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং অকৃত্রিমরূপে অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। এই ধর্মবিশ্বাস শুধুমাত্র নবীকে অনুসরণ করে প্রার্থনা, উপবাস এবং হজ করাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁর মতো চেহারা, কেশবিন্যাস, তাঁর মতো পোষাক, তাঁর মতো চলাফেরা, তাঁর মতো কথা বলা, তাঁর মতো নিদ্রা, খাওয়া দাওয়া, তাঁর মতো আচারব্যবহার আর অনুষ্ঠান, আর সর্বোপরি তিনি যা ভালাবাসেন তাকে ভালবাসা আর যা ঘৃণা করেন তাকে ঘৃণা করা।** এই প্রবণতা তুর্কীরা ছাড়া আর যে যে বিদেশী রাষ্ট্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল তাদের জাতীয় চরিত্রের উপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছিল। যেহেতু নবী আরবদেশ এবং তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ভালবাসতেন সেহেতু, বিদেশী মুসলিম রাষ্ট্রগুলি তাদের নিজেদের দেশ ও সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করে আরবদেশ ও তার ঐতিহ্যকে ভালবাসতে শুরু করে। এখানে লক্ষণীয় যে নবী ইসলামে অবিশ্বাসীদের ঘৃণা করতেন। যেহেতু ঐসব বিদেশী জাতির পূর্বপুরুষেরা অবশ্যম্ভাবীরূপে অমুসলিম ছিলেন সেহেতু তাঁরা নিজেদের পূর্বসূরীদেরকে ঘৃণা করে আরব নায়কদের ভালবাসতে শুরু করে। সমস্ত মুসলিমরা এক জাতি এবং সমস্ত অমুসলিমরা আরেক জাতি, নবীর এই ঘোষণা বিদেশী মুসলিমদের সাথে আরব ঐক্য ত্বরান্বিত করল, কিন্তু যেহেতু আচরণবিধি ছিল আরবী,

সেহেতু আরব এবং বিদেশী মুসলিমদের মধ্যে সম্পর্কটা দাঁড়ালো নেতা এবং অনুগামী বা প্রভু এবং ভৃত্যের। এই প্রভাব যা মুখ্যতঃ ব্যক্তিগত ছিল, পরে তা বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিতেও অনুপ্রবেশ করে। উদাহরণ স্বরূপ অধিকাংশ মুসলিম উপাসনাগৃহ আরবদেশের মক্কা ও মদিনায় অবস্থিত, কিন্তু বিদেশে অবস্থিত অন্য সব উপাসনাস্থলগুলি এদের সমমর্য্যাদা পায় না। **বিদেশী মুসলিমদের এই সংস্কৃতিগত আনুগত্য এক হীনমন্যতার আকার ধারণ করেছে কারণ তাদের চিন্তাভাবনা ও কাজ আরবদেশ ও সংস্কৃতির মাপকাঠিতে নির্ধারিত করা হবে। ফলতঃ বিদেশী মুসলিমদের মাতৃভূমির প্রতি প্রায়শঃই কোনো আনুগত্য থাকে না কারণ তাদের কোনো জাতীয় মর্য্যাদাবোধ গড়ে উঠে না। এ আর কিছুই নয় নবী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতাবলে বিদেশী মুসলিমদের উপর তাঁর নিজের জাতিকে সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকার দিয়ে গেছেন। তিনি নমস্য কারণ তাঁর উদ্ভাবনী ক্ষমতার প্রভাবে তিনি আরবদেশ ও বিদেশী মুসলিমদের মধ্যে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ও পতঙ্গের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। এই পতঙ্গেরা স্বতঃ প্রণোদিত ভাবে দীপশিখার মধ্যে নিজেদেরকে আহুতি দেবার জন্য উন্মুখ, প্রদীপ তাদের একাজে বাধ্য করে না। ইতিহাসে এই দৈবী সাম্রাজ্যবাদের আর কোনো তুলনা নেই।** প্রায় বারোটি আরবদের দ্বারা বিজিত দেশ "আরব দেশসমূহ" নামে এখনও তাদের অধিকারে আছে। কৌতূহল জাগে সেই সব দেশের আদি জনসম্প্রদায়গুলির পরিণতি সম্বন্ধে। অবশ্যই তারা নিজেদের প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে রেখে আরব নামেই পরিচিত হতে চায়।

এই এক ও অদ্বিতীয় মুসলিম জাতিবাদের ধারণা অথবা সার্বভৌম আরব কর্তৃত্ব একদা সভ্যতার স্তম্ভ স্বরূপ কিছু জাতি সম্বন্ধেও সমান ভাবে প্রযোজ্য। মিশরীয়দের কী পরিণতি হয়েছিল, যারা মহান্ 'ফারাও'দের অনুগামী, ইতিহাস যাদের তিনহাজার বছর ব্যাপী গৌরবময় অতীতের সাক্ষ্য দেয়। তারা সবাই আরব হয়ে গেছে। ক্ষমতাশালী ইরানীদেরও একই পরিণতি হয়েছে, যাদের বারো শ বছরের গৌরবময় অতীত ছিল এবং যাদের মধ্যে বড়ো মাপের নবী বা ঈশ্বরের দূতের আবির্ভাব হয়েছিল। ইরাণীদের এতোই জাঁকজমক ছিল যে তাদের রাজকীয় দরবারের ঐতিহ্যকে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, রোমান্ সম্রাটেরা ও অন্যান্য ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুকরণ করেছিল। তারা রোমের আইনকে প্রভাবিত করেছিল। এশিয়া মহাদেশে বিদেশী আগ্রাসনকে রুখে দিয়েছিল এবং রোমানদের বারংবার পদানত করেছিল। তাদের ধর্মগুরু বা দার্শনিক আচার্য্যেরা যেমন জরথুষ্ট্র, মানি প্রভৃতি, ধর্ম এবং বিশ্বের

চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তারা আরবদের ধর্মীয় উপগ্রহে পরিণত হয়ে গেছে, তাদের জাতীয় নক্ষত্ররাও তাই অস্তমিত। ভারতবর্ষেও এই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এই দেশ বিশ্ব সভ্যতাকে সর্বাপেক্ষা প্রভাবিত করেছে। ইস্পাত, তুলা এবং জলের ক্ষেত্রে এই দেশের কারিগরী কুশলতা আন্তর্জাতিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছে এবং এই দেশের দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধীয় আন্দোলন, পূর্ব এবং পশ্চিমের মানুষকে ও তাদের মনকে প্রভাবিত করেছে এবং নির্ণয়াত্মক ক্ষমতা দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ভারত, তৃতীয় বিশ্বের নিম্নতম সোপানে অবস্থান করছে। হিন্দুরা দেশকে রক্ষা করতে সমর্থ হলেও, বর্ণাশ্রমের প্রথা মানে বলে জাতিবাদ বা জাতীয়তাবাদকে মর্য্যাদা দিতে শেখেনি। ইসলামধর্মের অনুপ্রবেশের আগে ভারত শুধু যে মুক্ত ও স্বাধীন ছিল তাই নয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী ও প্রগতিশীল দেশ ছিল। এই দেশ মিশরের মতো আরব রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হল না কারণ এর শক্তিশালী স্থানীয় প্রভাব। অন্যদিকে ইরাণের মতো আপাতদৃষ্টিতে জাতীয় চরিত্র রক্ষা করতে পারলো না কারণ এই দেশের গৌরবময় সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যও ছিল না। ফলতঃ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের চল্লিশ কোটিরও বেশি মুসলিমদের জাতিবাদ সম্বন্ধে কোনো ধারনাই গড়ে ওঠেনি। **নিজেদের মাতৃভূমির প্রতি কোনো ভালবাসা বা শ্রদ্ধা না থাকায় তারা নিজভূমে পরবাসী**। জাতীয় চেতনার সাথে দেশবাসীর সম্পর্ক যেন শরীরের সাথে মেরুদণ্ডের সম্পর্ক। অতএব এটা খুব স্বাভাবিক যে এইসব লোক বিভ্রান্ত হবে যতদিন না তারা বুঝতে পারে যে তাদের দেশ হল, যেখানে তারা জন্মেছে, আরব নয়। অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে কারণ এই সব দেশ অতি দরিদ্র, এবং সামাজিক অত্যাচারের শিকার। এখানে ন্যায় এবং ব্যক্তির অধিকার, শুধুই কথার কথা, আসলে কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীত আচরণই দেখা যায়। **এটা খুবই স্বাভাবিক যে, যে ব্যক্তির জীবনে আনন্দ থাকে না, সে সাধারণতঃ তার স্বপ্নই দেখে থাকে। অতএব এইসব দেশের মুসলিম অধিবাসীরা এই জীবনে স্বর্গীয় আনন্দে বঞ্চিত হয়ে মৃত্যুর পরে তাদের বঞ্চিত হৃদয়ের আকাংক্ষার পরিপূরণের তীব্র আশা নিয়ে বেঁচে থাকে। যেহেতু নবীর হাতেই এই স্বর্গের চাবি তাই তারা উন্মাদের মতো নবীর অনুগামী হয়।**

তারা স্বর্গে প্রবেশের অধিকারের জন্য মহম্মদের নামে সব কিছু করতে প্রস্তুত। জাতীয় জীবনে টিকে থাকার জন্য, মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য যে লড়াই, এটাই দেশবাসীকে মহত্ত্ব দেয়। যারা আরবদেশের অধিবাসী নয় এই সব মুসলিমদের জাতীয় সত্তাকে নষ্ট করে দিয়ে ইসলাম ধর্ম মিশর, ইরান , ভারত প্রভৃতি সভ্যতার কেন্দ্রগুলিকে

ধ্বংস করে দিয়েছে। এই তথ্যের প্রমাণ সুদুর প্রাচ্যদেশগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মহিমা ও গৌরব যারা ইসলামের ধারণার বশবর্তী হয়নি এবং যুক্তি ও জাতীয় স্বার্থ যাদের পথ প্রদর্শন করে থাকে। জাপান, চীন, তাইওয়ান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ এখন ক্ষুধা, ব্যাধি এবং অত্যাচারের কবল থেকে প্রায় মুক্ত। এইসব দেশ পৃথিবীতেই স্বর্গ রচনা করতে সমর্থ হয়েছে যখন ইসলামে বিশ্বাসীরা এক কল্পিত স্বর্গের স্বপ্নে বিভোর এবং শুধুমাত্র হতাশা এবং বঞ্চনায় দিন দিন আরো বেশী ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামির শিকার হয়ে উঠছে। এটাই ইসলামী মৌলবাদের উত্থানের কারণ। এমন নয় যে তারা ইসলাম ধর্ম পালন করতে চায় কারণ আধুনিক জগতে ইসলাম বাস্তবজনোচিত নয়। তারা ইসলামের প্রকৃতি না জেনেই শুধুমাত্র প্রচারের স্বার্থে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবী করে থাকে। প্রত্যাদেশ চিরকালের জন্য নয়, এবং তা মানুষের সমস্যার সমাধান করতে অপারগ। মানুষের সমস্যার সমাধান মানুষই করতে পারে। **মুসলিমরা দাবী করে যে ইসলাম জীবনের আচার আচরণের এক পরিপূর্ণ সঙ্কলন বা সার সংগ্রহ। এটি এরকম কিছুই নয়।** এই জন্য ইসলামের লম্বা ইতিহাসে কোনোসময়ই ইসলামিক শাসনতন্ত্রের অবতারণা করা হয়নি। যারা মানুষকে বোকা বানিয়ে, লোকের ধর্মসংক্রান্ত দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায় এ তাদেরই রাজনৈতিক জিগির। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভারতকে ভাগ করে ইসলামিক শাসনতন্ত্রের অবতারণা করার জন্য পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। অর্ধশতাব্দীব্যাপী ভাবনাচিন্তার পরেও ইসলামিক শাসতন্ত্র সম্বন্ধে কারোরই ধারণা স্পষ্ট হয়নি এবং আগামী শতাব্দী এবং তারও পরে এই ধরণের শাসন প্রচলনের কোনো সম্ভাবনাই দেখা যায় না। এ ছিল শুধুই একদল ক্ষমতালোভী মানুষের দাবী, যারা "ইসলাম" শব্দটির সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা ও ধন অর্জন করতে চেয়েছে। যদি এই সব নেতাদের দাবী ন্যায় সঙ্গত হতো তো তারা অবশ্যই ইসলামিক শাসনতন্ত্র বলতে কী বোঝায়, মানুষের কাছে তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতেন, কাজ শুরু করবার আগে।

যেহেতু মুসলিমরা দিনের পর দিন আরো মৌলবাদী হয়ে উঠছে, সেহেতু ইসলামের মুখ্য অনুশাসনগুলির পর্য্যালোচনা প্রয়োজন, যাতে আধুনিক জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি অবান্তর না হয়ে ওঠে।

১। সর্বপ্রথমে ইসলাম ঘোষণা করে যে শাসনতন্ত্র ঈশ্বরের। না, শাসনতন্ত্র মানুষেরই। মানুষের মনুষ্যত্ব তার স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশের মধ্যে, অর্থাৎ স্বাধীন ভাবে গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষমতা। সে, তা করতে পারে তখনই, যখন শাসনতন্ত্র মানুষদ্বারা পরিচালিত হয়।

২। মুসলিমরা দাবী করে,

ক) ইসলাম একটি বিশেষধরণের শাসনতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দেয়

খ) এবং এই বিশেষ ধরণই গণতন্ত্র।

দুটির একটি দাবীও যথার্থ নয়। প্রথমতঃ যখন নবীর মৃত্যু হয় তখন উত্তরাধিকারের তীব্র সমস্যা দেখা দেয়। কী করে তাঁর উত্তরাধিকার স্থির হবে, সে বিষয়ে তিনি কোনো নির্দেশ রেখে যাননি। যদিও শিয়া সম্প্রদায় দাবী করে যে নবী, আলিকে শাসনতন্ত্র অধিগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত না নেওয়া প্রমাণ করে যে ইসলামী ধরণের শাসনতন্ত্র বলে কিছু নেই।

স্বল্পসংখ্যক কিছু আইনকে ইসলামিক আখ্যা দেওয়া, বিশেষতঃ যখন বেশীর ভাগই ইরাণ থেকে ধার নেওয়া হয়েছে, এর ভিত্তিতে কোনো স্বতন্ত্র স্বাবলম্বী শাসনতন্ত্র তৈরী করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামিক শাসনতন্ত্র গণতান্ত্রিক নয়। একজন কুরেশীকেই এর শীর্ষস্থানীয় শাসক হতে হবে। বড় জোর এটি একটি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক শাসিত বা অল্পতান্ত্রিক হতে পারে।

এর প্রথম চারজন শাসক বিভিন্ন প্রকারে নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবু বকর কৌশলে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওমরকে আবু বকরই র্নিবাচন করেছিলেন। অবদ্-উর-রহমানকে মনোনয়ন মেনে নিতে রাজী করাতেনা পেরে, ওমর ছয় জনের এক সমিতি তৈরী করলেন তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য। তারা উথ্মানকে বেছে নিল। ছয়জনের দ্বারা নির্বাচন নিশ্চয়ই গণতন্ত্র নয়। যখন উথ্মান কে হত্যা করা হল তখন আলিকে খলিফার মর্য্যাদায় উন্নীত করল তার নিজের 'হাহিমাইট' উপজাতি। কারবালার যুদ্ধ এবং হুসেনের বীরগাথা সবাই জানে। আসল কথা হ'ল এরপর থেকে ইসলামিক খলিফাতন্ত্র, বংশানুক্রমিক শাসন এবং রাজতন্ত্রে পরিণত হ'ল। তৃতীয়তঃ খিলাফত-এ-রশিদা অর্থাৎ প্রথম চার খলিফার শাসনকে ইসলামের সুবর্ণযুগ বলে ধরা হয়, এবং আদর্শ ইসলামিক শাসনতন্ত্রও বলা হয়। অতএব একে অনুসরণ করার উপর জোর দেওয়া হয়। **দুর্ভাগ্যবশতঃ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীরা এই যুগটির সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য জানে না।** এই সময় নববই শতাংশ আরবরা নবীর মৃত্যুর পর 'জাকাত' দেওয়া বন্ধ করে 'মুরাদ' হয় গেল। এমনকি তারা সবাই মদিনাকে আক্রমণ করলো। আবুবকরের বীরত্ব এবং সময়োচিত কাজ তাদের পরাস্ত করলো। তারা

যদি সফল হতো তো সেদিনই ইসলামের মৃত্যুঘণ্টা বেজে যেত। একমাত্র 'আবুবকর' এরই আঠারো মাস রাজত্ব করার পর স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু 'ওমর', 'উথ্মান' এবং 'আলি' নিহত হয়েছিলেন। এসময়টা কী ধরণের সুবর্ণযুগ ছিল তা ঘটনা পরম্পরায় আরো বোঝা যায়। এসময় আরবদের রোজগার হতো অমুসলিমদের হত্যা ও লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে যাকে এরা বলতো 'জেহাদ'। মিশর এবং ইরান প্রথমেই আক্রান্ত হয়েছিল। লুণ্ঠিত ধনসম্পদ এবং বিদেশ থেকে লুণ্ঠিত মেয়ে এবং বোনেরা এই আরব যুগকে সোনার পরশ দিয়েছিল।

৩। তারা দাবী করে যে ইসলাম সমাজবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অবশ্যই ইসলাম দানের পক্ষপাতী এবং বিশ্বাসীদের যা কিছু প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তা দান করার পরামর্শ দিয়ে থাকে, কিন্তু এটা পুরোপুরি নীতিগত ব্যাপার, ইসলামিক আইনের সাথে এর কোনো যোগ নেই। কারণ ইসলাম মূলতঃ সামন্ততান্ত্রিক। ইসলাম প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে থাকে যে ঈশ্বর তাকেই রাজা করেন যাকে তাঁর ভাল লাগে। তিনি হিসাব বা মূল্যায়ন না করেই ব্যক্তি বিশেষকে ধন দান করেন। ধন, নানাপ্রকারের হতে পারে, টাকা, ভূসম্পত্তি, বাড়ী ইত্যাদি। এর মানে গণতন্ত্র ও সমাজবাদ দুটোই ইসলাম বিরোধী।

৪। ইসলামের কোনো অর্থনীতি নেই। যেমন এখানে সুদ দেওয়া এবং নেওয়া দুটোই নিষিদ্ধ। অর্থনীতিতে সুদ একটি প্রয়োজনীয় বস্তু। এছাড়া কোনো অর্থনৈতিক কাঠামো অচল। সবধরণের মুসলিম নেতৃত্ব, রাজনৈতিক এবং ধার্মিক, যারা সুদের বিরুদ্ধে জিগির তোলে, তারা প্রত্যেকেই ব্যাঙ্ক, বাড়ী তৈরীর সমবায়, বীমা কোম্পানি এবং ন্যাশনাল বণ্ড থেকে সুদ পেয়ে থাকে। এমনকি ইসলামিক শাসনতন্ত্রগুলিও চড়া সুদে তাদের পেট্রোডলার ধার দিয়ে থাকে। যদি না অত্যাচার করে আদায় হয়, সুদের অসুবিধার থেকে সুবিধাই বেশী।

৫। ইসলামিক আইনগুলি আদৌ কার্য্যকরী নয় কারণ ১৪০০ বছর আগে এগুলির সৃষ্টি হয়েছিল, যেমন হিজাব বা পর্দাপ্রথা। কোরাণে কঠোরভাবে এই বিষয়ে অনুশাসন জারি করা হয়েছে। তবু প্রায় সব মুসলিম দেশই এই অনুশাসন মানে না। বহুবিবাহ, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন, বিবাহ বিচ্ছেদ, খুলা প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই এটা দেখা যায়। এই সমস্ত দুর্বলতা ঢাকবার জন্য ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা সকলকে বিভ্রান্ত করে আনন্দ পায়। যতই ইসলাম বিরুদ্ধ প্রথা হোক্ না কেন এরা তাকে কোরাণ এবং হাদিসের দ্বারা অনুমোদিত বলে প্রচার করে থাকে।

৬। অমুসলিমদের প্রতি ইসলামধর্মের ঘৃণাই ইসলামকে মানবাধিকারের বিরোধী করেছে। এই কারণেই মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে অমুসলিমদের খুব একটা দেখা যায় না। নবী তাঁর অনুগামীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আরবদেশ থেকে সব মূর্ত্তিপূজক নিকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদের তাড়িয়ে দিতে হবে এবং স্বয়ং ইহুদীদের নির্বাসিত করেছিলেন। বস্তুতঃ একটি হদিস্ এ আছে যে একজন মুসলিম ক্রুদ্ধ হয়ে যদি একজন ইহুদীকে চড়ও মারে, তাকে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তেমনি একজন মুসলিম একজন অমুসলিমকে হত্যা করলেও তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। এছাড়া ইসলামতন্ত্রের আক্রমণকারী চরিত্র সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে ওঠে যখন দেখা যায় ভারতে অবস্থিত হিন্দুধর্মের কেন্দ্র বেনারসেও মুসলমানদের বহু মসজিদ রয়েছে, কিন্তু মক্কায় কেউ একটাও মন্দির, গীর্জা কিংবা 'সিনাগগ্' তৈরী করতে পারেনি এবং পারবেও না। কোরাণ মুসলিমের সাথে অমুসলিমের মেলামেশার বিরুদ্ধে। অতএব সব মুসলিম রাষ্ট্রের কাছে রাষ্ট্রসঙেঘর সদস্য হওয়া ইসলাম বিরোধী। অতএব ইসলাম কতটা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের আদর্শে বিশ্বাসী, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ইসলামিক সংস্কৃতি

আগের অনুচ্ছেদগুলিতে ইসলামিক সংস্কৃতির ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইসলামিক সংস্কৃতি কাকে বলে? ইসলামিক সংস্কৃতি মৌলবাদী কারণ অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণাই এর উৎস। ইসলামিক রাষ্ট্রে আইনের সাহায্যে অমুসলিমদের বিরুদ্ধে বিভেদমূলক নীতি অনুসরণ করা হয়, এবং তাদের 'জিজিয়া' কর দিতে বাধ্য করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামিক সংস্কৃতি আরব সাম্রাজ্যবাদেরই ফলশ্রুতি, যা, আরব নয় এমন সব মুসলিমদের জাতীয়তাবোধকে দুর্বল করে দিয়েছে, এবং অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে তারা নিজেদের মুসলিমরূপে পরিচয় দিতে পছন্দ করে, যা আরব ঐতিহ্য অনুসারী এবং নিজেদের ভারতীয়, পাকিস্তানি, ইরানী কিংবা আফগান পরিচয় অস্বীকার করে থাকে। এইভাবে ইসলামের নামে সহজেই তাদেরকে উত্তেজিত করে এমন সব কাজ করানো যায়, যা তারা স্বাভাবিকভাবে করতে রাজী হবে না। এছাড়া যেহেতু প্রত্যেক মুসলিমের কাছে, অমুসলিমদের শাসন করাই ধর্ম, সেই হেতু এই সংস্কৃতি বড়ই আক্রমণাত্মক।

ইসলামিক আইন অনুসারে, একজন মুসলিম একজন অমুসলিমের প্রতি বন্ধু ভাবাপন্ন হতে পারে না, এমনকি সে যদি তার মা, বাবা, ভাই, বোন বা পুত্রও হয়। সে তাদের জন্ম বা মৃত্যুর অনুষ্ঠানাদিতেও অংশগ্রহণ করতে পারে না। ইসলামের একটি অসুবিধাজনক দিক আছে যা মুসলিম রাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতো কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হতে বাধা দিয়ে থাকে এবং মানবাধিকার বা পৌর স্বাধীনতার মতো আদর্শকে শ্রদ্ধা করতে শেখায় না। ইসলাম শান্তির পক্ষে বিপজ্জনক।

ইসলাম স্বৈরতান্ত্রিক সংস্কৃতি তাই গণতন্ত্রের পরিপন্থী কারণ গণতন্ত্রে সামাজিক ন্যায় এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব আছে। যেহেতু ইসলামে শাসনতন্ত্র আল্লাহ্‌র তাই মুসলিমরা আল্লাহ্ এবং নবীর তৈরী আইন প্রশ্নাতীতভাবে মানতে বাধ্য তা যতই অবাস্তব বা অনুপযুক্ত হোক্ না কেন। স্বৈরতন্ত্রই আক্রমণাত্মক মনোভাবের উৎস।

ইসলাম খুবই উদ্ভট কারণ এখানে হিংসাকে গৌরবান্বিত করা হয় এবং অমুসলিমদের হত্যা করা এবং লুঠ করাকে পবিত্র কাজ বলা হয় এবং তাদের নারীজাতিকে অপহরণ করা হয় আল্লাহ্র নামে, যিনি সর্বশক্তিমান অথচ তাঁর মহিমাকীর্ত্তনের জন্য একান্তই মানুষের উপর নির্ভরশীল। তিনি নিজেকে অত্যন্ত দয়ালু বলে ঘোষণা করেন অথচ অত্যন্ত হীন, নিষ্ঠুর ব্যবহার ধার্য্য করেন তাদের জন্য যারা তাঁকে দেবতা বলে মানে না। হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন, অপহরণ ইত্যাদি হ'ল সবথেকে নিকৃষ্ট মানের নৈতিক স্খলন। তবু মুজাহিদিনরা যখন অমুসলিমদের এইসব হীন কর্মের সাহায্যে নতি স্বীকারে বাধ্য করে, আল্লাহ্ তখন তাদের সমর্থন জানিয়ে থাকেন। এই ধরণের আক্রমণাত্মক নৈতিকতা অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর। মুসলিমরা একে "জেহাদ" বলে—ধর্মযুদ্ধ যা অধর্মের পথে মানুষকে পরিচালিত করে। কোনো রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না, যদি না তা মহত্তর ন্যায় ও নীতির পথে চলে। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলিমদের নৈতিকতা জাতীয় বিবেকের অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক দুর্বলতা ইসলাম মতাবলম্বীদের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের কারণ। নবীর অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে তাঁর অনুগামীদের নৈতিক স্খলন সত্ত্বেও স্বর্গে স্থান পাওয়ার আশ্বাস দিয়ে এই সব দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা মগজ ধোলাইএর কাজ করে যাচ্ছে। জনগণকে সামাজিক অন্যায় ও অর্থনৈতিক শোষণের শিকার বানানোর জন্য এই সব নেতারা নবীর নামে তাদের বোকা বানিয়ে যাচ্ছে**এর ফলে এই সব দেশে সামাজিক ন্যায় এক প্রহসন বা উপহাসের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাথে সাথে, সবুরে মেওয়া ফলে এই আশায় তারা ভেবে আসছে যে মৃত্যুর পর ক্ষতি পূরণ স্বরূপ নবী তাদের স্বর্গে প্রবেশ নিশ্চিত করে দেবেন। এসব কারণে মুসলিমরা দিন দিন আরো মৌলবাদী ও আক্রমণকারী হয়ে উঠছে এবং নিজেদেরকে মানবসমাজের অস্তিত্বের বিপন্নতার কারণরূপে উপস্থাপিত করেছে।**

এই আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে যে শুধুমাত্র নূতনত্ব আছে তাই নয়, মহম্মদকে যারা ঈশ্বরের প্রতিনিধিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে থাকেন, এমনকি তাঁকে আল্লাহ্র থেকেও শ্রেষ্ঠতর ভেবে থাকেন, তাদের কাছে এই আলোচনা ঘৃণিত ও নঞর্থক মনে হবে। "প্রত্যাদেশ," যা নবীত্ববাদের মূলকেন্দ্র, যুক্তিবাদের পরীক্ষায় তা উত্তীর্ণ হয় না। এই বিষয়টি 'ইটারনিটি' ও 'ইউনিভার্সাল মিস্ট্রি,' এই দুটি গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। বিশদ ব্যাখ্যা না করেও বিষয়টিতে আলোকপাতের উদ্দেশ্যে আরো দুটি কারণ দেখানো যায়। ইসলাম, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্ সার্বভৌম এবং সম্পূর্ণ

নিরপেক্ষরূপে উপস্থাপিত করেছে। প্রত্যাদেশ সংক্রান্ত মতবাদ একে দুটি কারণে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছে। প্রথমতঃ কোরাণ, আল্লাহ্‌কে ভালবাসা এবং ভক্তির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল এইরূপে প্রদর্শন করে। তিনি অবিশ্বাসীদের শাপ দিয়ে থাকেন এবং প্রচণ্ড কষ্টকর নারকীয় শাস্তির ভয় দেখান এবং সুরসুন্দরী, কুমারী কন্যা ও সুন্দর অল্পবয়স্ক কিশোরদের স্বর্গের অন্যতম আকর্ষণ ও উৎকোচ হিসাবে পেশ করে লোভ দেখান। এরকম কোনো দেবতা নিরপেক্ষ বা স্বনির্ভর হতে পারেন না, যাঁর সুখ এবং দুঃখ মানুষের তাঁকে ঈশ্বররূপে স্বীকৃতি দেওয়া বা না দেওয়ার উপর নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, প্রত্যাদেশ সংক্রান্ত মতবাদ ঈশ্বরকে মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল করে, সেই মানুষ যিনি নিজেকে প্রত্যাদেশবাদী বা নবী বলে ঘোষণা করেন। এ হেন ঈশ্বর কখনোই স্বতন্ত্র, সার্বভৌম, সৃষ্টিকর্তা হতে পারেন না।

কেউ কেউ এই অসুবিধা এড়াতে নবীকেই ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলে গ্রহণ করে থাকেন। যেমন খৃষ্টানরা যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বর প্রতিম, ঈশ্বরের পুত্র, বা ঈশ্বর বলে মনে করে থাকেন, তেমনি বেশীর ভাগ মুসলিমই মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র, সৃষ্টির কারণ কিংবা ঈশ্বর বলে মনে করেন। বিশ্বাস যদি শুধুমাত্র অবাস্তব কোনো ধারণা না হয়, তবে নবীর এমন কোনো প্রত্যক্ষ গুণ থাকা উচিত যা তাঁকে দেবতা বলে আলাদা মর্য্যাদায় ভূষিত করতে পারে। কিন্তু আমরা জানি নবী জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন। তিনি খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করেন এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেন। তিনি কামনার বশীভূত, সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন, সুখ ও দুঃখ তাঁকে ব্যাকুল করে। তিনি অসুস্থ হন এবং নিরাময়ের জন্য ঔষধের উপর নির্ভরশীল। তাঁর বার্ধক্য আসে এবং পরিশেষে মৃত্যু হয়। এসবই মানবিক লক্ষণ তাহলে কিভাবে নবীকে দেবোপম বলা যায়?

এটা বোঝা উচিত যে মানুষ উন্নত প্রাণী, কারণ সে বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন, চিন্তাশীল, যুক্তিবাদী এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী। অতএব যা মানুষের বিচারবুদ্ধির কণ্ঠরোধ করে তা অমানবিক ও মানবজাতির বিরোধী। অতএব যে বিশ্বাস মানুষকে হাস্যকর, উদ্ভট্ জিনিষকে ন্যায়সঙ্গত ভাবতে শেখায় তা ভ্রান্ত। যেহেতু নবীবাদের উৎস প্রত্যাদেশ যুক্তির পরীক্ষায় সম্পূণ ব্যর্থ, সেহেতু নবীর প্রতি বিশ্বাস একটি ভ্রান্তি যা ভয়, ঐতিহ্য এবং প্রচারের দ্বারা প্রোৎসাহিত।

মহম্মদের নবীত্ব নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের বিশালতা ও চমৎকারিত্বই আলোচ্য। তিনি ছিলেন মানবজাতির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম জাতীয় নেতা। তাঁর ব্যক্তিত্বের এই বিশালতা তাঁর নবীত্বের দাবীর কাছে গৌণ হয়ে গেছে। অতএব ধর্ম বাদ দিয়ে তাঁর

জাগতিক মহিমার পরিমাপ করলে আমরা **মহম্মদকে পাই আরব সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে**।এই বিষয়ে তাঁর অভূতপূর্ব সাফল্য তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যক্তি মর্য্যাদাকে বহুগুণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।

মহম্মদ অনাথ ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্নেহময় পিতামহ ও কাকা তাঁর জীবনের এই ক্ষতি অনেকখানিই পূর্ণ করেছিলেন। তাঁর বংশমর্য্যাদা তাঁর অক্ষমতা লাঘবে সাহায্য করেছিল। তিনি কুরেশ জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত ছিলেন, যাঁরা মক্কার মন্দির 'কাবা'র প্রভু ছিলেন বলে সামাজিক মর্য্যাদা পেতেন এবং পরে আল্লাহ্র নিজের লোক বলে খ্যাতি লাভ করেন। খাদিজার সাথে বিবাহ সূত্রে মিলিত হওয়া ছিল তাঁর জীবনে আশীর্বাদ স্বরূপ, যা তিনি ছাবিবশ বছর ব্যাপী উপভোগ করেছিলেন। খাদিজা ছিলেন একনিষ্ঠস্ত্রী যাঁর ধনসম্পদ ও সমর্থন তাঁর স্বামীকে প্রভূত সাহায্য করেছিল। তিনিই প্রথম তাঁর স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর উদ্দেশ্যকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তাঁর নিকটাত্মীয় ও যাকে তিনি দত্তক নিয়েছিলেন সেই 'আলি' ছিল তাঁর দ্বিতীয় শিষ্য এবং তাঁর ভূতপূর্ব দাস জাইদ ছিল তাঁর তৃতীয় শিষ্য। মহম্মদের জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের সাফল্যের পশ্চাতে, আবু বকরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, ইনিও মহম্মদের প্রথম দিককার একজন বিশিষ্ট শিষ্য ও সম্পদশালী মিত্র। এইভাবে মহম্মদের একটি ছোট্ট অনুগত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর দৃঢ়চিত্তের উচ্চাকাংক্ষা পূরণের ক্ষমতা এবং উপায়।

ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর নাম ও মহিমা প্রচারের নির্দেশ পেয়েও নবী প্রথম তিনবছর জনসমক্ষে আল্লাহ্র বাণী ও উপদেশ প্রচার করেননি, যদিও তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদের এই নতুন মতবাদের সাথে পরিচিত করিয়েছিলেন। এটা খুবই বিভ্রান্তিকর ব্যাপার যে আদমপূর্ব নবী হয়েও তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সের আগে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেন নি। তাহলে কী বুঝতে হবে যে তিনি চারদশক ব্যাপী কর্তব্য কর্মে অবহেলা করেছিলেন। সম্ভ বতঃ তিনি তাঁর নবীত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না।

'প্রত্যাদেশ' মানুষকে (অর্থাৎ প্রত্যাদেশবাদীকে) দেবত্বে ভূষিত করে কিন্তু ঈশ্বরের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে কারণ তখন ঈশ্বর প্রত্যাদেশবাদী বা নবীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন তাঁর ইচ্ছাকে কার্য্যে রূপ দেবার জন্য। মানুষের ভক্তি ও ভালবাসা পাওয়াই ঈশ্বরের সব থেকে বড় আকাংক্ষা। যে হেতু মানুষই ঈশ্বরের এই তীব্র আকাংক্ষার নিবৃত্তির মাধ্যম সেহেতু মানুষ ঈশ্বরের থেকেও উচ্চ মর্য্যাদার আসন লাভ করে। অতএব এই প্রত্যাদেশ সংক্রান্ত মতবাদ ঈশ্বরের মর্য্যাদার হানিকর। এছাড়া কেউই

ঈশ্বরকে দেখতে পায় না বা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে না। নবী মানুষের সাথে কথা বলেন অতএব তিনি ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক হয়ে যান। এই বিষয়টি মুসলিম জগতে ব্যাপক সত্য কারণ মুসলমানেরা আল্লাহ্‌র থেকেও নবীকে বেশী ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে যে নবী যাকে খুশী মুক্তি দিতে পারেন, কিন্তু নবীর অনুমতি বা পরামর্শ ছাড়া আল্লাহ্‌ তা পারেন না।

যাইহোক্ প্রত্যাদেশ একটি অত্যন্ত ভাল কৌশল যা নবীকে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে সংযোগকারীর ভূমিকায় নিয়ে আসে। যদি সব কিছু ভাল চলে, সাফল্যের জন্য নবীর সুনাম হয়, আর যদি তা না হয়, নবীর প্রতি কেউ দোষারোপ করতে পারে না কারণ ঈশ্বরই সবকিছুর মূল কারণ এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁর ইচ্ছাকেই মর্য্যাদা দেওয়া উচিত। প্রত্যাদেশের বিশেষ সুবিধা হল এই যে এখানে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বত্র বিরাজমানরূপে প্রচার করা হয়। অতএব ঈশ্বরের নামে ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে ইচ্ছামতো পরিচালনা করা সহজ হয়ে যায়। এছাড়া প্রত্যাদেশের আরেকটি চমৎকারিত্ব হল এই যে নবী অত্যন্ত মর্য্যাদার আসন লাভ করেন এবং ব্যক্তি হিসাবে পূত পবিত্র হয়ে যান এবং তাঁর বাণীকেই স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী মনে করা হয়।

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে নবী মোটেই প্রচ্ছন্ন ন'ন, তিনি এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। মানুষের ভাললাগা ও মন্দলাগার উপর কর্তৃত্বের প্রভাব খাটিয়ে, তিনি নিজেকে তাদের নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি অপরিমিত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়মিশ্রিত ভালবাসা দাবী করে থাকেন। যদিও তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সৈনিক বা সেবক বলে থাকেন, কার্য্যতঃ তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ঈশ্বর বলেই বিবেচিত হন। ঈশ্বর এক হতমান ব্যক্তি বিশেষ যিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন এবং অনুসন্ধান করেও যাঁর সন্ধান পাওয়া যায় না। অতএব তাঁকে পেতে হলে তাঁর সব ভক্তকেই নবীর মধ্যস্থতা মেনে নিতে হবে।

এই কারণে কোরাণে মহম্মদ ও আল্লাহ্‌কে অভিন্ন মানা হয়। তাঁরা দুজনে মিলে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাঁদের বিরোধিতা করার ক্ষমতা কারোর নেই। কোরাণ নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে যে শেষ বিচারের দিনে মহম্মদ আল্লাহ্‌র ডান দিকে আসন গ্রহণ করবেন। ঈশ্বরের অপূর্ণতা ও অসহায়তা এখানে স্পষ্ট এবং বিষয়টি স্পষ্টতর হয় যখন দেখা যায় যে শুধু আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রাখলেই মুসলিম হওয়া যায় না। আল্লাহ্‌ ও মহম্মদ উভয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখা অত্যন্ত বাধ্যতামূলক।

কিন্তু, কেউই নবী হতে পারবে না যদি না একজন ঈশ্বর থাকেন। "প্রত্যাদেশ" একটি সেমিটিক কার্য্যপ্রণালী। এই জন্য সমস্ত সেমিটিক জনগোষ্ঠীরই নিজস্ব ঈশ্বর আছে এবং প্রতিটি স্থানীয় শাসক তার ঈশ্বরের নামে একটি আইনের সংকলন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে থাকে এবং নিজেকে সেই ঈশ্বরের সেবক ও প্রতিনিধি বলে দাবী করে থাকে। যদিও সে তাঁর খুশীমতো জনগণকে শাসন করে থাকে কিন্তু তাঁর নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ রূপে ঘোষণা করে থাকে। এর দুটি সুবিধা আছে, প্রথমতঃ এটি তাদের শাসনকে এক নৈর্ব্যক্তিক রূপ দেয়, যেন ঈশ্বরের আদেশেই তাদের এই কর্তব্য পালন এবং দ্বিতীয়তঃ এটি তাদের শাসনতন্ত্রকে এক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করে **যা জনগণের মধ্যে বিশেষরূপে জাতীয় ও সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি করতে সাহায্য করে কারণ তাদের ঈশ্বর অভিন্ন এবং তিনি তাদের জীবন তরণীকে সুখে দুঃখে সঠিক পথে পরিচালিত করতে আগ্রহী।** যেমন আধুনিক কালে মাতৃভূমি বা পিতৃভূমিই জাতিবাদের কেন্দ্রস্থল, তেমনি সেমিটিক সংস্কৃতিতে আদিবাসীদের ঈশ্বর বা জাতীয় ঈশ্বরই জাতির পরিচিতির আধার। 'ইয়াওয়ে''র অবস্থান, দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে থাকা ইহুদীদের এই জাতীয় পরিচিতি এনে দিয়েছে। এছাড়া এদের পক্ষে জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে সচেতনতা বজায় রাখার আর কোনো উপায় ছিলনা।

পয়গম্বর মহম্মদ একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জানতেন যে নেতার মহত্ত্ব তাঁর অনুগামীদের উৎকর্ষের উপর নির্ভর করে। অতএব তিনি একটি উন্নত জাতির সৃষ্টি করতে চাইলেন এবং আরব জাতির পুনর্গঠনের জন্য তাঁর একটি মেরুদণ্ডের প্রয়োজন ছিল।

সেই সময় আরবজাতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে জাতিগত কোনো ঐক্য ছিল না, শুধু বিদ্বেষ এবং হানাহানির সম্পর্ক ছিল। এই কারণেই 'কাবা' সর্বেশ্বরবাদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, যা অনেক দেবতার আবাসস্থল, যার সৃষ্টির মূলে ছিল গ্রীক, রোমান, ইরানী, ভারতীয় প্রভৃতি বিদেশী প্রভাব। এইভাবে বিভিন্ন আরব জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন দেবতার প্রতি বিভিন্ন পরিমাপের ভক্তির প্রকাশ দেখা যেত। এই সমস্তই বিভেদ মূলক এবং জাতীয় ঐক্যের পরিপন্থী ছিল।

এই কারণেই একজন জাতীয় দেবতার সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। মহম্মদের কাছে এই ধরণের একটি নজির ছিল। অর্থাৎ মোজেস্, যিনি খৃষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে ইজরায়েল নামে এক জনগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি একজন মহৎ দিব্য

প্রেরণাপ্রাপ্ত শিক্ষক ও উপদেষ্টা ছিলেন। সন্দেহ নেই যে মহম্মদ 'টোরা'র বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন—বাইবেলের যে পাঁচটি খণ্ড মোজেস দ্বারা রচিত বলে প্রচারিত। এর সত্যতা প্রমাণিত হয় যখন ওয়র্কা ইব্‌ন নৌফল, মহম্মদের স্ত্রী খাদিজার আত্মীয়, যিনি একজন শিক্ষিত ইহুদী ছিলেন, তিনি হিরার গিরিকন্দরে, মহম্মদের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার কথা ব্যাখ্যা করেছিলেন।

মোজেসের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে তিনি মহম্মদের জীবনের আদর্শ ছিলেন। তাঁকে মহম্মদ অনুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করেছেন। মোজেস মিশরের রাজদরবারে রাজপুত্রের ন্যায় পালিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর দেশবাসী হিব্রুগণ নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত দাসত্ব প্রথায় বন্দী ছিল। তারা ছিল উচ্ছৃঙ্খল জনতা, তাদের কোনো সামাজিক সংগঠন বা জাতীয়তাবোধ ছিল না। তাদের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য মিশরের ফারাও প্রতিটি পুরুষ শিশুর জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন। মোজেস তাঁর দেশবাসীকে মিশরের দাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য সাহস ও দৃঢ় সংকল্প দেখিয়েছিলেন।

মোজেস একজন যোদ্ধা ও সেনানায়ক ছিলেন। দেশগঠনের কাজে এই গুণগুলি সহায়ক হলেও শুধুমাত্র এতেই কার্য্যসিদ্ধি হত না। যেমন ফারাও তাঁর ঐশী ক্ষমতাবলে মিশরীয়দের শাসন করতেন, সেইরকম মোজেসকেও দিব্য মর্য্যাদা অর্জন করতে হয়েছিল এবং অলৌকিক শক্তির সাহায্যে মানুষকে প্রভাবিত করতে হয়েছিল।

মোজেস্‌ 'জেথ্‌রো'র মেয়ে 'জিপোরা'কে বিবাহ করে পশুপালনের দায়িত্ব নিলেন। একদিন যখন তিনি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চারণ-ভূমির সন্ধানে, তখন তিনি একটি পর্বতের সানুদেশে উপস্থিত হয়ে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখে অভিভূত হলেন। তিনি দেখলেন যে একটি ঝোপ জ্বলছে অথচ পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে না। যখন তিনি বিস্ময়াহত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, একটি কণ্ঠস্বর তাঁকে আদেশ করলো আর অগ্রসর না হতে। **এ ছিল ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর যিনি নিজেকে আব্রাহাম, আইজ্যাক এবং জেকবের দেবতারূপে ঘোষণা করলেন। তিনি তাঁকে হিব্রুদের মিশরীয়দের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্য আহ্বান জানালেন। এইভাবে মোজেস নিজেকে তাঁর দেশবাসীর পরিত্রাতারূপে প্রতিষ্ঠা করলেন।** তাঁর এই পরিত্রাণ কার্য্যটি ইহুদীদের দেবতা 'ইয়াওয়ে'র শক্তি প্রর্দশন করল, যিনি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে ফারাওকে পরাভূত করলেন। ইহুদীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমানরূপে দেখানোর প্রয়োজন ছিল, যাতে কেউ তাঁকে অবজ্ঞা করতে না

পারে। 'ইয়াওয়ে' নামের অর্থ সৃষ্টির দেবতা। এর অর্থ ইহুদীদের দেবতা প্রকৃতি এবং বিশ্বের, সমস্ত দেশ ও জাতির সার্বভৌম প্রভু।

প্রাচীন বিশ্বে মূর্ত্তিপূজা ছিল একমাত্র গ্রহণযোগ্য পূজা পদ্ধতি। ভক্তদের দেবতার রূপ কল্পনা করে পূজা করতে হ'ত। মোজেস এই উপাসনার পদ্ধতিতে একটি নূতন মাত্রা যোগ করলেন। ইয়াওয়েকে রূপাতীত রূপে ঘোষণা করে, তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন যে ঈশ্বরকে পাথর কিংবা অন্য কোনো বস্তুর দ্বারা রূপায়িত করা যায় না এবং এইভাবে মূর্ত্তিপূজার অবসান ঘটালেন। হিব্রুরা মিশরীয়দের কাছ থেকে নানা প্রকারের দেবতার উপাসনা করতে শিখেছিল। ইয়াওয়েকে প্রতিহিংসাপরায়ণ ও ঈর্ষান্বিত দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা করে মোজেস তাঁর দেশবাসীকে একটি মাত্র ঈশ্বরকে বিশ্বাস ও উপাসনা করতে শেখালেন। এই দেবতাই জাতীয় ঐক্যের কারণ এবং অভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের প্রতীকরূপে অধিষ্ঠিত হবেন। দেশবাসীকে ইয়াওয়ের অপূর্ব মহিমা সম্বন্ধে নিঃসংশয় করবার জন্য "এক্সোডাস"এর ১৯ এবং ২০ পরিচ্ছেদে তাঁর আবির্ভাবের সাথে মাউন্ট সিনাইতে এক প্রচণ্ড ঝড়ের অবতারণা করা হয়েছে। এটি একটি ইঙ্গিতবাহী অভিজ্ঞতা যা মোজেস এবং আর সকলের কাছে অবিস্মরনীয় হয়ে থাকবে।

মোজেসের সব থেকে বড়ো চাল হলো সিনাইতে ঈশ্বরের সাথে তাঁর চুক্তি। 'হিটাইটদের আদর্শে তিনি এটি তৈরী করেন অর্থাৎ যে শর্তে সার্বভৌম হিটাইট প্রভু তাঁর অধীনস্থ সামন্ত রাজাদের সাথে সন্ধির চুক্তি করতেন। এটা ছিল তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শনের স্বীকৃতি স্বরূপ এবং যতদিন সামন্তরাজরা প্রভুর নির্দিষ্ট আইন মানবে এবং অনুগত থাকবে, ততদিনই এই চুক্তি স্থায়ী হবে। সামন্তদের অন্য কোনো আইন মত চলবার অধিকার ছিল না। এটি ছিল একেশ্বরবাদের উৎস অর্থাৎ একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা। এইরূপে "পেন্‌টাটিউক" বা 'টোরা' ছিল ঈশ্বরের আইন যা সমগ্র ইহুদীজাতিকে ঐক্যবন্ধনে এনেছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী মোজেস ছিলেন "ইয়াওয়ে" বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। যেমন তাঁর পূর্বসূরীগণ অর্থাৎ আব্রাহাম, নোয়া, জেকব প্রভৃতিরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হয়েছিলেন এবং তাঁদের কর্তব্য ছিল দেশবাসীকে ঈশ্বরের অনুগত করে রাখা।

ইসলামকে আব্রাহামের ধর্ম বলে ঘোষণা করে মহম্মদ অধিকাংশ ইহুদী নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। মূলতঃ তিনি ইহুদীদের সাথে তাঁর নিজের গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ চেয়েছিলেন, যাতে তিনি ইহুদীদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে

সমৃদ্ধ হতে পারেন এবং সেইজন্য তিনি ইহুদীদের চমৎকারিত্বের প্রচুর প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে ইহুদীরা তাদের জাতীয় পরিচয় হারাতে নারাজ, তখন তিনি তাদের প্রতি সরাসরি ঘৃণা প্রকাশ করে অবিমিশ্র আরব জাতির প্রতিষ্ঠা করলেন। এইজন্য তিনি ইহুদীদের অনুকরণ করলেন।

১। তিনি একান্ত আরবদের জন্যই একটি দেবতার প্রতিষ্ঠা করলেন, যাতে তারা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করতে বাধ্য হয়, এবং জাতীয় ঐক্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

২। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি পয়গম্বর বলে ঘোষণা করলেন, অর্থাৎ তিনি হবেন ঈশ্বরের নির্দেশের একমাত্র মাধ্যম।

৩। তিনি একটি পবিত্র আরব্য ধর্ম পুস্তক সৃষ্টি করতে চাইলেন যা ইহুদীদের মাতৃভাষায় লিখিত 'টোরা'র সমগোত্রীয়।

৪। একটি 'সম্পূর্ণ পৃথক আরবজাতি গঠনের জন্য তিনি তাঁর লোকেদের আশ্বস্ত করতে চাইলেন যে **ঈশ্বর আব্রাহাম এবং ইসমায়েলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, আব্রাহাম এবং আইজ্যাকের সাথে নয় যা কিনা** ইহুদীরা দাবী করে থাকে। (ইসমায়েল আরবদের পূর্বপুরুষ ছিলেন আর আইজ্যাক ছিলেন ইহুদীদের পূর্বজ) এখানেই জাতীয়তাবোধব্যঞ্জক মনোভাবের প্রকাশ দেখা যায়।

৫। সর্বোপরি আরব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবশ্যই ইসলামধর্মের সাথে সম্পৃক্ত করে নিতে হবে যাতে ইসলাম আরবদের কাছে সহজেই গ্রহণযোগ্য হয় এবং **'আরব নয় এরকম মুসলিমদের উপর তাদের আধিপত্য বজায় থাকে**।

৬। পয়গম্বরের দূরদৃষ্টি এবং জাতীয় কল্যাণ স্পৃহা প্রতিষ্ঠিত হয় যখন তিনি ইসলামের মধ্যে সর্বজনীন ভাবনার উদ্বোধন করেন যাতে তা আরব জাতীয়তাবোধের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

৭। মোজেসের মতো পয়গম্বর মহম্মদও তাঁর জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি র জন্য যুদ্ধ বৃত্তিই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর লোকেদের মধ্যে যোদ্ধাসুলভ প্রবৃত্তি তৈরী করবার জন্য মহম্মদ হত্যা এবং লুণ্ঠনকে পবিত্র কর্তব্য বলে চিহ্নিত করেছিলেন, যা তাদের স্বর্গের পথে নিয়ে যাবে, যেখানে বিলাসব্যসনের পটভূকিায় অপূর্ব সুন্দরী কুমারী ও কুমারগণ মুসলিম শহীদদের জন্য প্রতীক্ষা করে এবং তাদের রমণীয়তা ও সেবার দ্বারা মোহিত করে থাকে। ঈশ্বরের নামে অন্যান্য জাতির উপর লুণ্ঠন ও হত্যাকে, পয়গম্বর "জেহাদ" বলেছেন, যা ধর্মসম্বন্ধীয় নয় এমন ক্ষেত্রে কর্তৃত্বের আনন্দ এবং পরজগতে স্বর্গীয় আনন্দ দেয়।

এসবই জাতীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য। নবী, ইসলামের কাঠামোটি গঠন করেছিলেন নিজের ব্যক্তিগত পবিত্রতাকে ঘিরে এবং এজন্য নিজেকে আচরণীয় আদর্শস্থল, এবং মানবজাতির প্রতি আশীর্বাদ স্বরূপ প্রেরিত এবং একমাত্র মধ্যস্থস্বরূপ বলে ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্যই তিনি জাতিকে নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এটাও জানতেন যে নেতার শ্রেষ্ঠত্ব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের উপর নির্ভরশীল। অতএব তিনি মানবসমাজকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করেছিলেন

ক) মহম্মদ মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

খ) তাঁর পরিবার 'বানু হাসিম' সকল পরিবারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

এই প্রসঙ্গে অনেক হাদিস্ আছে। যদি কুরেশরা আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় **তবে, আরবজাতি নিশ্চয়ই অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই বিষয়টি স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায় যে একমাত্র কুরেশদেরই শাসন করবার অধিকার আছে। যেহেতু কুরেশরা আরব, এর থেকেই বোঝা যায় যে যারা আরব নয়, মুসলিম বা অন্য ধর্মাবলম্বী, তারা আল্লাহ্র ইচ্ছানুসারে আরবদের দ্বারা শাসিত হবে, এটাই তাদের ভাগ্য।**

১। কেন পয়গম্বর আল্লাহ্কে ইসলামধর্মের দেবতারূপে নির্বাচন করলেন? 'কাবা'র সর্বেশ্বরবাদের মন্দিরে, আল্লাহ্ অনেক মূর্ত্তির মধ্যে একজন মূর্ত্তি ছিলেন। কিন্তু "আল্লাহ্র নিজের লোক" বলে পরিচিত কুরেশদের সাথে সম্পর্কই এঁর বৈশিষ্ট্য ছিল। একথা সকলে জানে যে অন্য আরব রাজ্যগুলিতে, যেমন 'সাবা'তে (দক্ষিণ আরব) আগেকার শাসনতন্ত্র "মুকারিব"দের হাতে ছিল। এঁরা ছিলেন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত যাজক রাজন্যবর্গ, যাঁরা প্রদেশগুলিতে ধর্মীয় ও পৌরক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। খৃষ্টপূর্ব ১১৫ এবং ১০৯ সালে, 'হিমাইরি' নামে প্রদেশে এই যাজক রাজ ছিল। আরব উপমহাদ্বীপের ঐতিহ্য অনুসারে, সাধারণতঃ প্রাদেশিক শাসনকর্তা হতেন স্থানীয় দেবতার যাজক বা খলিফা। এই আরোপিত দৈব কর্তৃত্বই তাঁকে জনসাধারণকে শাসন করবার ক্ষমতা দিত। পশ্চিম আরব বা মক্কাতেও এই প্রথাই বলবৎ ছিল। আল্লাহ্র কৃপাই কুরেশদের যাজকসুলভ রাজবংশের মর্য্যাদা দিয়েছিল, কারণ আল্লাহ্ই ছিলেন কুরেশদের উপজাতীয় দেবতা এবং মহম্মদও কুরেশ ছিলেন। মহম্মদের দূরদর্শিতাই তাঁকে আল্লাহ্র একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তাকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অন্য সব বিদেশী প্রভাব থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন আরব উপজাতীয় দেবতাদের নস্যাৎ করার পথ দেখিয়েছিল।

আল্লাহ্‌র মহিমাকীর্তনের জাতীয় গুরুত্ব ছাড়াও মানসিক গুরুত্ব ছিল। তার কারণ, এছিল কুরেশদের খুশী রাখার পথ, যাদের সামজিক মর্য্যাদা অন্যান্য উপজাতিদের প্রভাবিত করতে পারবে। যেহেতু আল্লাহ্ ছিলেন কুরেশ দেবতা, সেহেতু অন্যান্য আরব উপজাতীয়দের পক্ষে কুরেশদের ধর্মীয় সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া সহজ ছিল, যখন তা আল্লাহ্‌র আদেশরূপে গণ্য হবে।

আল্লার একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য সব দেবতাদের মূর্ত্তি এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌র মূর্ত্তি ও ধ্বংস করা প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ্‌র অসীম ব্যক্তিত্ব কোনো তামা, ব্রোঞ্জ বা অন্যান্য ধাতু বা পদার্থ দ্বারা রূপায়িত করা যায় না। পয়গম্বর অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। আল্লাহ্‌কে সর্বোচ্চ এবং র্দুবোধ্য করে তুলে তিনি তাঁর দেবত্বকে ভাগ করে নিতে পেরেছিলেন, কারণ তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যার সাথে আল্লাহ্ কথা বলেন। কোরাণ সুস্পষ্টভাবে একথা বলে থাকে।

"আল্লাহ্ ও তাঁর পয়গম্বর কোনও বিষয়ে আদেশ দিলে যে বিষয়ে কোনও বিশ্বাসীর, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, নিজস্ব কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। যে আল্লাহ্ ও তাঁর পয়গম্বরের আদেশ লঙঘন করে, সে স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত পথে চালিত হয়েছে।"

(দ্য কনফেডারেট্‌স্-২০)

একথা সুস্পষ্ট যে আল্লাহ্ এবং মহম্মদ একই ব্যক্তি, কারণ যা কিছুই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তা, দুজনে মিলে গ্রহণ করে থাকেন। একজনের অবাধ্য হওয়া মানেই অপরজনের বিরুদ্ধাচরণ করা।

ইহুদীদের মতো আরবদেরও অভিন্নতার স্বাদ পাওয়ার জন্য অভিন্ন দেবতারও প্রয়োজন ছিল। আরবদের ক্ষেত্রে এটি আরো জরুরী কারণ তারা জাতি ও গোষ্ঠীর ভিত্তিতে সবসময় যুদ্ধরত ছিল বলে তাদের এক জাতিতে পরিণত করার জন্য এক অভিন্ন সার্বভৌম দেবতার প্রয়োজন ছিল।

মহম্মদের দূরদর্শিতা এবং আরবপ্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁর বিশ্বজনীনতার ধারণার মধ্যে। ইহুদীদের দেবতা "ইয়াওয়ে" শুধু ইজরায়েলের ঈশ্বর কিন্তু পয়গম্বর "আল্লাহ্"কে বিশ্বের দেবতা রূপে ঘোষনা করলেন। এখানেই মহম্মদের জাতীয়তাবাদের তত্ত্ব নিহিত রয়েছে।

তাঁর দেশকে উচ্চতর সামাজিক মর্য্যাদা দেবার জন্য, তিনি আরবদেশের

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিলেন। অতএব যারাই ইসলামে বিশ্বাসী তারা সবাই আরবভূমির ধর্মীয় সার্বভৌমত্ব এবং সাংস্কৃতিক মূল্য স্বীকার করতে বাধ্য। এরকম একটি প্রতিষ্ঠান হল 'কাবা'।

এই প্রসঙ্গে "জায়ন" (ZION) এর উল্লেখ প্রয়োজন। খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ডেভিড এই "জেবুসাইট" নগরটিকে দখল করে নিয়েছিলেন এবং তাদের রীতিনীতি গ্রহণ করেছিলেন। ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে পর্বতের উপর জেরুসালেমের নির্মাণ হয়, "জায়ন" তারই ক্যানানাইট নাম। ওল্ড টেস্টামেন্টে এই নামটি ১৫২ বার উল্লিখিত হয়েছে। এইভাবে 'জায়ন', পর্বতের পরিবর্তে জেরুসালেম এর আর এক নাম হয়ে গিয়েছে। ধর্মবিশ্বাসী বা নাস্তিক, সবাই জানে "জেরুসালেম" মানেই পবিত্র স্থান, তবু "জায়ন" নামটির সাথেই ধর্মীয় সংবেদনশীলতা রয়ে গেছে। কারণ 'জায়ন' পর্বতই ইহুদী দেবতা 'ইয়াওয়ে'র আবাসস্থল,এখানেই তিনি থাকেন (ইসা ২৪ : ২৩) এবং যেখানে তিনি রাজা ডেভিডকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন (প্রি.এস.২:৬) যদিও খৃষ্টপূর্ব ৫৮৬ সালে জেরুসালেম ব্যবিলনবাসীদের হাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তবু, 'জায়ন' এর মধুর স্মৃতি ইজরায়েলবাসীর হৃদয়ে আঁকা হয়ে গিয়েছিল (প্রি.এস.১৩৭)। জেরুসালেম থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর, তারা আবার ফিরে আসবে এই ভবিষ্যৎ বাণীই "জায়ন"কে ইয়াওয়ে কর্তৃক প্রতিশ্রুত মুক্তাঞ্চলের মর্য্যাদা দিয়েছিল। 'জায়ন'এ ফিরে আসতেই হবে, যেখানে তারা 'ইয়াওয়ে' কে পাবে (জব-৩১)। যদিও উপাসনাগৃহটি জেরুসালেমেই অবস্থিত, 'জায়ন'এর প্রতি শ্রদ্ধাই তাকে ইহুদীদের আবাসভূমির মর্য্যাদা দিয়েছিল। 'জায়ন' জুডাইজম্ এর প্রতীক এবং ইহুদীদের মহত্ত্বাকাংক্ষার কেন্দ্ররূপে পরিচিত। 'জায়নিজ্ম' নামে পরিচিত এই আন্দোলনটির অর্থ হল প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের স্থায়ী বাসভূমির প্রতিষ্ঠা। এবং এটি জায়ন বা জেরুসালেমের প্রতি শ্রদ্ধারই নামান্তর। ইহুদীদের ধর্মবিশ্বাস ও মহত্ত্বাকাংক্ষার কেন্দ্রভূমি হয়ে জায়ন অর্থাৎ জেরুসালেম ইহুদীদের মর্য্যাদাবোধ ও একত্ববোধকে বাঁচিয়ে রেখেছে যদিও বহু শতাব্দী ধরে তারা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এইজন্য, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা অন্যত্র স্বদেশভূমি প্রতিষ্ঠিত করেনি।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইযে অধিকাংশ ইহুদীরাই জাতিগতভাবে ইহুদী, অন্য জাতি থেকে খুব কম লোকই ইহুদী ধর্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু এই সব ধর্মান্তরিত ইহুদীরাও মূলতঃ বিদেশী হলেও জেরুসালেমকেই পবিত্র দৈবী মর্য্যাদায় ভূষিত স্বদেশ বলে মনে করে থাকে এবং তাদের জন্মভূমির উপরে স্থান দিয়ে থাকে।

এই বক্তব্যের পরে পয়গম্বর মহম্মদের জাতীয়তাবোধের ভাবনা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। মক্কার "ছোট্ট উপাসনাগৃহ" কাবা জাহিলিয়ার (ইসলামপূর্ব আরবদেশ) আরবদের কাছে ঠিক তেমনই পবিত্র ছিল যেমনটি 'জায়ন' বা জেরুসালেম, ইহুদীদের কাছে। কুরেশরা তাদের ধর্মীয় মর্য্যাদার কারণে মক্কার জলসিঞ্চিত পাথুরে উপত্যকাটিকে অত্যন্ত পবিত্র বলে ঘোষণা করতে পেরেছিল। এই কারণে 'কাবা' আববদেশের সর্বপেক্ষা পূণ্যভূমি বলে বিবেচিত এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ সেখানে তীর্থ বা 'হজ' করতে আসে। এজন্যই কুরেশরা মক্কার অভিভাবক। কুরেশ উপজাতির দেবতা 'আল্লাহ্' এইভাবে কাবার প্রভু হয়ে গেলেন। 'কাবা'য় 'হজ' করা এবং আনুষঙ্গিক পবিত্র নিয়মাবলী পালন করা ইত্যাদি, নবীর নির্দেশিকা অনুযায়ী ইসলামধর্মের মূল আচরণবিধির অন্তর্গত। প্রথমে তিনি ছোট্ট শহর মক্কাকে "সমস্তনগরীর মাতা" বলে ঘোষণা করলেন এবং তারপর 'কাবা'কে অত্যন্ত উচ্চস্তরের শ্রদ্ধাভক্তির আধার বলে নির্দেশ করলেন।

"আব্রাহাম এবং তার পুত্র ইসমায়েলই আবাস (কাবা)এর ভিত্তিস্থাপন করেছিল"

(দ্য কাউ : ১২০)

যেহেতু আব্রাহাম ওল্ড টেস্টামন্টেএ বর্ণিত এবং উচ্চ প্রশংসিত ইহুদী গোষ্ঠীপতি এবং ঈশ্বর কর্তৃক নিখুঁত ভাবে সৃষ্ট, সেহেতু তাঁর এবং ইসমায়েলের (যিনি মহম্মদের পূর্বপুরুষ) দ্বারা কাবার প্রতিষ্ঠা এই স্থানটিকে দৈবী মাহাত্ম্য এবং জাতীয় সম্মান প্রদান করে (দ্য কাউ:১৪৫)। কোরাণ 'কাবা'কে পবিত্র মসজিদ বলে ঘোষণা করে এবং সব দেশের মুসলিমদের কাবা অভিমুখে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নমাজ পড়ার নির্দেশ দেয়। এটা সাধারণতঃ তারা দিনে পাঁচবার করে থাকে। কল্পনা করে বিস্ময় জাগে যে সমস্ত মহাদেশের একশোকোটি মুসলিম দিনে বহুবার কাবা অভিমুখে প্রণত হয়ে থাকে। কোরাণ আরও বলে ঃ—

" লোকেদের জন্য প্রথম আবাস প্রতিষ্ঠিত হয় বেক্কা (মক্কা)তে, যেস্থান পবিত্র ও সকল প্রাণীর পথ নির্দেশক.....আল্লাহ্র প্রতি সকল মানুষের কর্ত্তব্য হচ্ছে, সামর্থ্য থাকলে, তীর্থযাত্রীরূপে এই আবাসে আগমন করা।" (দ্য হাউজ অব্ ইমরান্)

প্রতিটি সুস্থ সবল মুসলিমের সঙ্গতি থাকলে মক্কায় তীর্থযাত্রা আবশ্যিক। যদি সে তা না করে তবে তার বিশ্বাসযোগ্যতা থাকেনা এবং সে নরকে পচে মরে। কিন্তু যে মক্কায় তীর্থ করেছে, সে অবশ্যই স্বর্গে গিয়ে সুন্দরী কুমারীদের উপভোগ করতে

পারবে, যদি তারা ধর্ষক, হত্যাকারী, তস্কর, বিশ্বাসঘাতক এবং অপরাধীও হয়ে থাকে। **কাবার আনুষঙ্গিকে এই প্রতিশ্রুতির জন্যই মুসলিমরা আরব দেশকে স্বদেশের চেয়েও বেশী ভালবাসে এবং নিজেদেরকে ভারতীয়, পাকিস্তানি বা বাংলাদেশী না বলে মুসলিম বলা পছন্দ করে। তারা বুঝতে পারেনা যে আরব জাতীয়তাবাদের ঔজ্জ্বল্য তাদের নিজস্ব জাতীয়তাবোধের অনুভূতিকে অসাড় করে দিয়েছে। এর প্রভাব এতো গভীর যে তারা নিজেদের সত্য পরিচয় স্বীকার করে নিতে গ্লানিবোধ করে থাকে। এটি মগজ ধোলাইয়ের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা।**

প্রকৃতপক্ষে মক্কায় বিশাল মসজিদের কেন্দ্রস্থলে কাবা একটি ছোট্ট উপাসনা গৃহ। এই চতুষ্কোণ আকৃতিটি ধূসর ও শ্বেত প্রস্তর নির্মিত, এর কোণগুলি কম্পাসের কোণগুলির সাযুজ্যে নির্মিত। সারা বছর ধরে কাবা একটি কালো ব্রোকেড কাপড়ে ঢাকা থাকে। প্রতিটি তীর্থযাত্রীকে 'কাবা'র চারপাশে সাতবার ঘুরে কালোপাথরটিকে চুম্বন করতে হয়। কথিত আছে, স্বর্গ থেকে নির্বাসনকালে আদমকে ঈশ্বর এই পাথরটি দিয়েছিলেন। এই ছোট্ট আরব্য প্রস্তরখণ্ড টি পয়গম্বরের আশীর্বাদে পৃথিবীর সর্বত্র অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করে থাকে। **অথচ ইতিহাস বলে যে নবী হিসাবে প্রাথমিকভাবে তিনি 'কাবা'র প্রতি কোনো রূপ মনোযোগ দেননি। কিন্তু যখন ইহুদীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তখন তিনি জেরুসালেম থেকে কিব্‌লা তুলে নিয়ে 'কাবা'য় আরোপ করলেন। এটাও মনে রাখা উচিত যে কালো পাথরটিকে চুম্বন করা একটি ইসলামপূর্ব প্রথা যা ইসলাম ধর্মে বহাল রাখা হয়েছে আরব সংস্কৃতির অঙ্গরূপে। আজকের দিনেও তীর্থ যাত্রীরা এই কারণে ইসলামপূর্ব যুগের মতো পোষাক পরে থাকে। কালো পাথরটিকে চুম্বন করা এবং 'কাবা'য় তীর্থ যাত্রা জাহিলিয়া যুগের স্মৃতিচিহ্ন মাত্র, ইসলামের অঙ্গীভূত নয়। এই নিয়মগুলি বহাল রাখা পয়গম্বরের জাতীয় ভাবনা এবং ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করে থাকে।**

যতদিন একজন মুসলিম বাঁচে, সে 'কাবা'কে কিব্‌লা দেয় অর্থাৎ প্রণত হবার দিক্‌রূপে নির্দিষ্ট করে। এবং যখন সে মারা যায় তাকে কাবার দিকে মুখ করে সমাধিস্থ করা হয়। এইভাবে একজন মুসলিম জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত 'কাবা'র ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের দ্বারা পরিচালিত হয়। যারা আরব নয় এমন একশো কোটি মুসলিমের কাবার প্রতি বিশ্বাসজনিত নতিস্বীকারের মধ্যদিয়ে কী অভূতপূর্ব সম্মান নবী তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে উপহার দিয়েছেন।

'কাবা'র বৈশিষ্ট্য কিব্‌লা। মূলতঃ জেরুসালেমই মুসলিমদের কিব্‌লা ছিল। 'কাবা'কে কে কিব্‌লা দিল? কোরাণ বলে ঃ—

"আমরা (আল্লাহ্) তোমাকে (মহম্মদ) আকাশের দিকে মুখ ঘোরাতে দেখেছি, এবার আমরা তোমার মুখ এমন এক 'দিকে ঘুরিয়ে দেব যা তোমাকে সন্তুষ্ট করবে। পবিত্র মসজিদের দিকে মুখ ঘোরাও, এবং যেখানেই থাকোনা কেন, ঐ দিকেই মুখ ঘোরাবে।"

(দ্য কাউ ঃ ১৪৪)

"আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। তুমি যেখান থেকেই আসো না কেন, তোমার মুখ পবিত্র মসজিদের দিকে রাখবে। এই সত্য তোমার প্রভুর কাছ থেকে উৎসারিত হয়েছে।"

(দ্য কাউ ঃ ১৪৯)

কোরাণ অনুযায়ী জেরুসালেম থেকে পবিত্র কাবা অভিমুখে, উপাসনার দিক্ পরিবর্তন মহম্মদের প্রতি আল্লাহ্‌র বরদান যার জন্য মহম্মদ আকাশের দিকে তাকিয়ে অবিরত প্রর্থনা করেছিলেন যাতে আল্লাহ্ তাঁর প্রার্থনা শুনতে পান। এর অর্থ আল্লাহ্‌র নিজস্ব কোনো মতামত নেই। মহম্মদ তাঁর বাস্তব প্রতিরূপ, অতএব তিনি মহম্মদের ইচ্ছানুসারেই কাজ করে থাকেন। কিব্‌লার প্রতিষ্ঠা বা পরিবর্তন এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা আল্লাহ্‌রই বিশেষ অধিকার। **পয়গম্বর, একজন মানুষ, তাঁর এখানে কোনো বক্তব্য থাকার কথা নয়; যদি তিনি তা করেন তবে, হয় তিনিই 'আল্লাহ্' নয় যা কিছু 'আল্লাহ্' বলে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা আল্লাহ্ নয়।**

'আল্লাহ্'র ঐতিহাসিক পর্য্যালোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে আল্লাহ্ 'কাবা'র একটি মূর্ত্তিমাত্র একটি প্রাণহীন বস্তু যাকে মহম্মদ সর্বোচ্চ সত্তায় রূপায়িত করেছেন। স্পষ্টতঃই 'আল্লাহ্' মহম্মদের সৃষ্টি করেনি, মহম্মদই আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করেছেন। অতএব মহম্মদের ইচ্ছামতোই তাঁকে চলতে হবে।

যেমন 'ইয়াওয়ে' প্রদত্ত জেরুসালেমের পবিত্রতা ইজরায়েলকে এই পৃথিবীর মহত্তম ভূমির মর্য্যাদা দিয়েছে, তেমনি 'কাবা'কে 'কিব্‌লা'র মর্য্যাদা দান ইসলামিক বিশ্বে আরবের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। সবাই জানে এরই ভিত্তিতে ইহুদীরা জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করে, তবে আরবরাই বা তা করবে না কেন? মহম্মদও মোজেসের তুল্য জাতীয় নেতা ছিলেন। মহম্মদ আরো বড়ো কেননা ঘোষণা না করেই তিনি তাঁর নিজের জাতিকে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অর্পণ করেছেন। এই ঘটনা থেকেই মহম্মদের দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেম পরিস্ফুটিত হয়।

পয়গম্বর জানতেন যে ইহুদীদের জাতীয় দৃঢ়তার কারণ তাদের 'পবিত্র গ্রন্থ' অর্থাৎ 'ওল্ড টেস্টামেন্ট,' (যাকে সাধারণতঃ বাইবেল বলা হয়)। বাইবেল বা 'টোরা' মোজেস কর্তৃক রচিত হলেও 'দৈবী প্রত্যাদেশ' রূপে ঘোষিত। অতএব 'টোরা' ঈশ্বরের গ্রন্থ, ইহুদী জাতিবাদের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ শুধু তাদের দৈবী মর্য্যাদাই দেয় না, একজাতিরূপে তাদের বেঁধেও রাখে।

তাহলে আরবরাই বা কেন এই দৈবী মর্য্যাদা থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাদের একটা নিজস্ব গ্রন্থ কেন থাকবে না? এটা তাদের পক্ষে আরো জরুরী কারণ তারা খণ্ড খণ্ড যুদ্ধরত দলরূপে একে অপরের হত্যার মধ্য দিয়ে উপজাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করছিল। আরবদের একটি উন্নত ভাষা ছিল এবং তারা নিজেদের কাব্য নিয়ে গর্ববোধ করতো অতএব একটি ধর্মগ্রন্থ লাভ করার মর্য্যাদা তাদের প্রাপ্য। বিস্ময়ের কথা এই যে যদিও তারা নিজেদের উপজাতিকে অন্য উপজাতি অপেক্ষা আদরণীয় মনে করতো কিন্তু আরবী ভাষার ক্ষেত্রে দলনির্বিশেষে তারা সবাই এই ভাষাকে ভালবাসতো এবং উপভোগ করতো। আরবী ভাষায় এক প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ অবশ্যই তাদের জাতীয় ঐক্যবন্ধনস্বরূপ হবে এবং যুগে যুগে তাদের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

কোরাণ এরকমই এক গ্রন্থ। মহম্মদ দাবী করেন যে এতে নতুন কিছুই নেই। এটি অ্যাডামকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র বাণীর ধারাবাহিকতা রক্ষা করছে যা বংশানুক্রমিক ভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে।

"আল্লাহ্ অ্যাডামকে (আদম) ও নোয়াকে বেছে নিলেন" (দ্য হাউজ্ অব্ ইমরান্)

"এবং আমরা (আল্লাহ্) পূর্বে নোয়ার পথনির্দেশ করেছিলাম ও তারই বংশধারার ডেভিড ও সলোমন, জব ও জোসেফ ও আরন....." (ক্যাট্‌ল্-৮০)

এর থেকে স্পষ্ট হয় যে আল্লার ঐতিহ্য হল যুগে যুগে নোয়া, জোসেফ, মোজেস প্রভৃতি নবীদের মাধ্যমে মানবসমাজকে পথনির্দেশ দেওয়া। এই নির্দেশ আসে প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্ত দৈব গ্রন্থের মাধ্যমে। এরই ফলস্বরূপ আমরা 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' এবং "নিউ টেস্টামেন্ট" পাই। কিন্তু মহম্মদ ঘোষণা করেছিলেন যে ঈশ্বর এই ঐতিহ্য ভেঙ্গে তাঁকেই শেষ নবীরূপে পাঠিয়েছেন। (দ্য কনফেডারেটস্ : ৪০)। কিন্তু যুক্তি বলে যে যদি অতীতে ঈশ্বর মানুষকে পথনির্দেশ দিতে আগ্রহী থেকে থাকেন তবে শেষকাল পর্য্যন্তই তিনি তা করবেন। মানুষ আগের মতো

দুষ্টপ্রকৃতিরই রয়ে গেছে। যদি সে এখন নিজেকে পরিচালনা করতে পারে তবে অতীতেও অবশ্যই সে তা করতে পারতো। সেক্ষেত্রে এখনকার মতো সেই সময়েও প্রত্যাদেশ অপ্রাসঙ্গিক ছিল।

তাঁর অনুগামীদের কোরাণ প্রত্যর্পণ করার সময় পয়গম্বর বলেন যে অন্যান্য দৈব গ্রন্থসমূহ যেমন 'টোরা' এবং 'বাইবেল,' আর মানবসমাজকে পথনির্দেশ করতে পারবে না কারণ ইহুদী এবং ক্রীশ্চানদের দ্বারা এসবের বিষয়বস্তুগুলি ব্যাপকভাবে বিকৃত করা হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে কোরাণ আলাদা কারণ ওর বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা ঈশ্বরকর্তৃক প্রতিশ্রুত। এর কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন অসম্ভব। এটা কী আশ্চর্য্য নয় যে ঈশ্বর তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে উদাসীন হয়েও কোরাণের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ? কেন ? এর একটিই কারণ আছে। মহম্মদ কোরাণকে আরব জাতির বিবেকের অঙ্গীভূত করতে চেয়েছিলেন। অতএব এর আরবত্বকে তিনি বিশেষ মর্য্যাদা দিয়েছিলেন।

১) "পরম করুণাময় কোরাণ শিখিয়েছেন, তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন,"

(দ্য অল্ মর্সিফুল্ : ১)

এর অর্থ ঈশ্বর কৃপাপরবশ হয়ে মহম্মদকে গভীরভাবে কোরাণ শিক্ষা দিয়েছিলেন যাতে সে তার অনুগতজনকে গৌরবময় কোরাণের বাণী বোঝাতে পারে

(ক্বাফ্ : ১)

কোরাণের আরবী ভাষার উপর জোর দিয়ে নবী কোরাণের সাথে আরবদের জাতীয় সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

২) "আমরা এটাকে আরবী কোরাণ্‌রূপে প্রেরণ করেছি যাতে তোমরা সহজেই বুঝতে পারো,"

(যোসেফ : ১)

নিজেদের হীনমন্যতা ঢাকতে যারা আরব নয় এমন মোল্লারা বলে থাকেন যে কোরাণ এক দৈবী বাণী যা সকলের জন্য এবং দুর্বল ও সবল সবার মঙ্গলকারী।

আসলে কোরাণ আরবদের উদ্দেশ্যে আরবী ভাষায় লেখা যাতে আরবরা এর অর্থ বুঝতে পারে। অতএব কোরাণ আরব জাতীয়তাবাদের অংশ, বিশেষতঃ যখন এর বিষয়বস্তু আরব সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে।

১) আমি যা বলেছি সেটাই ঠিক। আমি কোনও ভুল ব্যাখ্যা করিনি। নীচের উদ্ধৃতি থেকেই বুঝতে পারবেন।

"জ্ঞানসম্পন্ন মানুষদের জন্য পরমকরুণাময় একটি গ্রন্থ প্রেরণ করেছেন যা আরবী কোরাণ্ রূপে চিহ্নিত হয়েছে...."

(ডিষ্টিঙ্গুইশ্ড্ ঃ ১)

কোরাণ্ যে আরবী ভাষাতেই রচিত, সে কথা আরও জোর নিয়ে বলা হয়েছে নীচের উদ্ধৃতিতেঃ

"সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ, আমি অবতীর্থ করেছি কোরাণ্‌রূপে, আরবী ভাষায়, যাতে, তোমরা বুঝতে পার। এ গ্রন্থ মহান্, সারগর্ভ-আমার নিকট সংরক্ষিত ফলকে আছে। তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় বলে কি আমি তোমাদের হতে কোরাণ্ প্রত্যাহার করে তোমাদের অব্যাহতি দেব?"

(অর্নামেন্ট্‌স্ : ১)

কোরাণের সারাংশ স্পষ্টতঃই আরবদের জন্য। এখানে 'লোক' বা 'মানুষ' কথার অর্থ 'আরব'। যদিও মোল্লারা খুব চেষ্টা করে "মানুষ" অর্থে মানবজাতি বোঝাতে। এই প্রসঙ্গে "দ্য নাইট জার্নি ঃ ১০৫" উল্লেখযোগ্য।

"এবং সেই জন্য আমরা তোমার কাছে আরবী কোরাণ উদ্‌ঘাটিত করেছি যাতে তুমি মক্কা ও তার আশে পাশে যারা বসবাস করে তাদের সতর্ক করতে পার..."

(কাউন্সেল : ৫)

যেহেতু "নগরীদের মাতা" মানে মক্কা এবং সেখানে আশেপাশে যারা থাকে অর্থাৎ আরব, এই পংক্তিগুলিই পরিশেষে নির্ণয় করে যে কোরাণ একটি "আরবী বই", বিশেষতঃ আরবদের জন্য নির্দিষ্ট। এবং এর বিশ্বজনীনতার অর্থ হ'ল যারা আরব নয় এবং যারা কোরাণের পবিত্রতায় বিশ্বাসী, তারা অবশ্যই কোরাণের প্রাপক অর্থাৎ আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি দেবে। কোরাণের জাতীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে আরবদের অবহিত করার জন্য বলা হয় ঃ— "যদি মানুষ ও অতিমানব (জিন্‌পরী) একত্রে কোরাণের মতো কিছুর সৃষ্টির প্রয়াসী হয় তবুও তারা এর সমতুল কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না, একে অপরকে যতই সাহায্য করুক না কেন।"

এই পংক্তিগুলির থেকে সুস্পষ্ট যে কোরাণই একমাত্র বই যা বারবার দাবী করে যে এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও আরেক ধরণের জীব আছে এবং তারা বোধ, বুদ্ধি

এবং কাজে মানুষের সমতুল্য বা শ্রেষ্ঠতর হতে পারে। কেউ কোনোদিন 'জিন্' দেখেনি। কিছু সংখ্যক মোল্লা বলে থাকে যে জিন্ মানে জীবাণু বা অতি ক্ষুদ্রকায় জীব বিশেষ। এরা কোরাণের অবমাননা করে কারণ কোরাণের তুল্য সৃষ্টির জন্য বুদ্ধিমান জীবের প্রয়োজন, তুচ্ছ পোকামাকড় নয়।

আরবদের জাতীয় জীবনে যুক্ত হবার জন্য কোরাণ বলে ঃ—

"অতএব কোরাণ যথাসাধ্য পাঠ কর"

(এন্‌র‍্যাপ্‌ড্ ঃ ১৫)

ইসলাম যে মূলতঃ আরবদের জাতীয় আন্দোলন এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য নিম্নলিখিত সূত্রগুলির পুনরালোচনা প্রয়োজন ঃ

১। পয়গম্বর ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, তাঁর জনগোষ্ঠী কুরেশরা আরব জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে প্রমুখ এবং আরবরা সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

২। এই জন্য তিনি পুরাতন সেমিটিক প্রথা অনুযায়ী প্রত্যাদেশের সাহায্যে নিজেকে পয়গম্বর বলে ঘোষণা করলেন, যাঁর নিজের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নেই এবং ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে তিনি কার্য্য করে থাকেন।

৩। যেমন ইহুদীদের জাতীয় দেবতা হলেন "ইয়াওয়ে," তেমনি পয়গম্বর আল্লাহ্‌কে বেছে নিলেন, যিনি "কাবা"র উপাস্য দেবমূর্তি, তাঁর নিজের জনগোষ্ঠীর উপাস্য এবং তাঁকে তিনি সর্বোচ্চ দেবতার মর্য্যাদা দিলেন।

৪। পয়গম্বর আরবদের পবিত্র উপাসনাস্থলকে ইসলামের পবিত্রতম তীর্থ বানালেন যাতে যে কোনো ইসলামে বিশ্বাসী ব্যক্তি অবশ্যই আরবদেশ ও তার অধিবাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

৫। তিনি 'হজ' অর্থাৎ 'কাবা'য় তীর্থযাত্রা, যা ইসলামপূর্ব যুগের আরবী প্রথা ছিল, তাকে তাঁর ধর্মের মূল আচরণ বিধির মর্য্যাদা দিলেন। যাতে বিদেশী মুসলিমরা আরবদেশের পবিত্রতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে পারে এবং এর দ্বারা আরবদেশের অধিবাসীদের জন্য চিরকালীন আয়ের এক উৎস খুলে দিলেন।

৬। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে ঈশ্বর আব্রাহাম এবং আইজ্যাকের সাথে নয়, আব্রাহাম এবং ইসমায়েলের সাথে চুক্তি করেছিলেন। সবাই জানে যে ইসমায়েল

আরবদের পূর্বসূরী। এইভ্রবে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, ইসলামের উদ্দেশ্য আরব জাতীয়তাবাদের মহিমা কীর্তন।

৭। 'কাবা' আরবদের অনেক বেশী জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করে যতটা না "জায়ন" বা "জেরুসালেম" ইহুদীদের জন্য করে। "কাবা" আরব জাতীয়তাবাদের অভিভাবক স্বরূপ। এই কারণেই যারা আরব নয় এমন মুসলিমরা কোনো বিশেষ জাতিরূপে নিজেদের ভাবতে পারে না, এবং নিজেদের মুসলিম বলে ভাবতেই পছন্দ করে। এই ভাবে আরবরা নিজেদেরকে কেন্দ্রীয় সত্তার আসনে বসাতে পেরেছে এবং যারা আরব নয় এমন মুসলিমরা খুশীমনেই তাদের উপগ্রহরূপে নিজেদেরকে মেনে নিয়েছে, স্বর্গলাভের আশায়। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, যে সব মুসলিম আরবদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন নয়, নবী তাদের জন্য স্বর্গের দ্বার খুলে দেবেন না। পয়গম্বর বলেছেন ঃ

ক) "আল্লাহ্ তাদের অবমাননা করুন যারা কুরেশদের (তাঁর জনগোষ্ঠী) অবমাননা করতে সচেষ্ট।"

(সাহী টার্মজি; ২য় খণ্ড :পৃ:৩৫)

খ) সুলেইমান ফার্সীকে (পারস্যদেশীয় শিষ্য) পয়গম্বর বলেছেন—"যদি তুমি আরবদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পোষণ কর, তো তুমি আমাকেও ঘৃণা কর।"

(সাহী টার্মজি : ২য় খণ্ড পৃ: ৮৪০)

গ) পয়গম্বর বলেছেন— "আমি তাদের হয়ে মধ্যস্থতা করব না বা ভালাবাসব না যারা আরবদের প্রতি ন্যায় করে না।"

(সাহী টার্মজি : ২য় খণ্ড পৃ: ৮৪০)

অবশ্য এইসব হদিস্এর যথার্থতা সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তবু এগুলি আছে। যদি যথার্থ না হতো তো এদের বাদ দেওয়া হতো। এগুলি সঠিক কারণ আরব জাতির ইসলামী আত্মিক বৈশিষ্ট্য এতে প্রকাশ পায়।

৮। তাঁর ব্যক্তিগত পবিত্রতাকে কেন্দ্র করে পয়গম্বর ইসলামের পরিকাঠামোকে গড়ে তুলেছেন। এইজন্য তিনি ঘোষণা করেছেন যে তিনি ঃ—

ক) একমাত্র মধ্যস্থতাকারী

খ) মানবজাতির জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ এবং

গ) বিশ্বস্ত অনুগামীদের আচরণবিধির আদর্শ।

যেহেতু মহম্মদ আরবদের অন্যান্য জাতির থেকে বেশী পছন্দ করতেন, সেহেতু আরব জাতিকে ভালবাসা ইসলামধর্মে অবশ্য প্রয়োজনীয়।

৯। যেহেতু ইসলাম ধর্ম মানেই আল্লাহ্ এবং মহম্মদ উভয়ের প্রতি বিশ্বাস, ইসলামে ঈশ্বরের দ্বৈত সত্তা, যেমন ক্রীশ্চানধর্মের "ট্রিনিটি" তত্ত্ব একের মধ্যে তিনের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। মহম্মদ একজন আরব ছিলেন, কাবার অধীশ্বর আল্লাহ্ও একটি আরবী মূর্ত্তি, অতএব ইসলামও আরবজাতির স্বার্থ সাধনের জন্য।

১০। কোরাণ একটি আরবী দলিল। এটি মূলতঃ আরবদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরিচালনার জন্য। একে বিশ্বজনীনতার বাণীরূপে আখ্যা দেওয়া শুধুমাত্রই যারা আরব নয় এমন মুসলিমদের আরবজাতির সার্বভৌমত্বের কাছে নতি স্বীকার করানোর এক কৌশল বিশেষ।

উল্লিখিত তথ্যগুলি সবই আরব জাতীয়তাবাদের উপকরণ ঃ

কিছু অলৌকিক, কিছু জাতিভিত্তিক। আরব জাতীয়তাবাদের ধারণার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করবার পরে, পয়গম্বরের পরবর্তী কাজ হল অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আরবদের এক যুদ্ধবাজ জাতিতে পরিণত করে, এমন এক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করা, যা আরবদের শ্রেষ্ঠত্বের উপযোগী হবে। পয়গম্বর যে শুধুমাত্র এক অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন তাই নয়, তাঁর মধ্যে অদম্য সাহস ও দৃঢ়তা ছিল। অবশ্যম্ভাবীরূপে তিনি "জেহাদ"কে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। জেহাদ কাকে বলে ?

জেহাদ অমুসলিদের ধ্বংস করার জন্য মুসলিমদের প্রতি আল্লাহ্‌র আদেশ। এর জন্যে মুসলিমদের প্রতি অমুসলিমদের অন্যায় আচরণের অজুহাতের কোনো প্রয়োজন নেই। তাদের প্রকৃত অপরাধ হল যে তারা ইসলামে বিশ্বাস করে না।

"আমি অবিশ্বাসীদের সাথে লড়াই করবার জন্য আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তারা আল্লাহ্ এবং তাঁর নবীকে বিশ্বাস করে এবং ইসলামের আইন অনুসারে চলে। একমাত্র তখনই তাদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার আশ্বাস দেওয়া যেতে পারে।

(সাহী টার্মিজি : ২য় খণ্ড পৃ: ১৯২)

কিজন্য অমুসলিমদের উপর অত্যাচার এবং তাদের ধ্বংস করা হবে। কোরাণ বলেঃ—

"নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ বেহেশ্তের মূল্য বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন, তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, (অন্য ব্যক্তিদের) নিহত করে অথবা (নিজেরা) নিহত হয়। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ.....নিজ প্রতিজ্ঞাপালনে আল্লাহ্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে, তোমরা যে সওদা করেছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং ঐটিই মহাসাফল্য।"
(রিপেন্ট্যান্স্-সূরা তওবা; ১১১)

জেহাদ, আল্লাহ্ এবং মুসলিমদের মধ্যে একটা চুক্তি। আল্লাহ্, মুসলিমদের স্বর্গে যাবার আশ্বাস দিয়ে থাকেন, পরিবর্তে তারা অমুসলিমদের হত্যা ও লুণ্ঠন করবে। এতে তাদের কোনো অপরাধবোধের প্রয়োজন নেই। এই নির্বিচার, নির্দয় হত্যা এবং সম্পত্তির লুণ্ঠন অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত কারণ এর বিশেষ পুরস্কার স্বর্গবাস। কোরাণ এই লুণ্ঠনজাত সংগ্রহকে সমর্থন করে।

" দেশে সম্পূর্ণভাবে শত্রু নিপাত না করা পর্য্যন্ত বন্দী রাখা কোনও নবীর জন্য সঙ্গত নয়...যুদ্ধে তোমরা যা লাভ করেছ তা বৈধ ও উত্তম বলে ভোগ কর।"
(দ্য স্পয়েল্স্-সূরা আনফাল ঃ ৬৭, ৬৯)

এখানেই জেহাদের সারাংশ। অমুসলিমদের আল্লাহ্র নামে আক্রমণ কর কারণ তারা অপরাধী, আল্লাহ্কে বিশ্বাস করে না। প্রথমে তাদের ব্যাপক ভাবে হত্যা কর, তখন তাদের সব সম্পত্তি, নারী ও সন্তানসহ আইনগত ও নীতিগতভাবে মুসলিমদের অধিকারে চলে আসবে এবং তারা তাদের খুশীমতো এসব ব্যবহার করতে পারবে।

মানুষের প্রতি মানুষের এরূপ ব্যবহারকে কী ন্যায়সঙ্গত বলা যায়? এজন্য ইসলামিক সভ্যতাকে আক্রমণাত্মক বলা হয়েছে। বিস্ময়ের কথা এই যে কীভ্রবে মুসলিমরা অমুসলিমদেশে মানবিক অধিকারের দাবী জানায়, যখন তারা নিজেদের দেশে অমুসলিমদের মানুষ বলেই মনে করে না। ক্রীশ্চান এবং ইহুদীরা মুসলিমদের সমান এবং এদেরকে অবিশ্বাসী বা নাস্তিক বলে গণ্য করা হবে না, কোরাণে লেখা একথা খুবই রহস্যজনক। (কারণ 'হাদিস' এ আছে যে ক্রীশ্চান এবং ইহুদী, যে মহম্মদের নাম শোনা সত্ত্বেও, তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে না, সে অগ্নিতে দগ্ধ হবে)।

কীজন্যে আরবদের দেবতা 'আল্লাহ্' অমুসলিমদের মানবিক অধিকারের বিরুদ্ধে ? কারণটা স্পষ্ট। তাঁর নিজের জাতির লোকের মর্য্যাদা বাড়াবার জন্য পয়গম্বর এক আরব সাম্রাজ্য তৈরী করতে চেয়েছিলেন, কারণ বাইজানটাইন, ইরাণী প্রভৃতি জাতির

রাজকীয় মহিমার কাছে আরবরা নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। এইসব যুদ্ধবাজ জাতিরা যুদ্ধের মধ্য দিয়েই তাদের জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি তে বিশ্বাস করতো। আরবরা তখনও এখনকার মতো আরবীয় মনোভাবাপন্ন ছিল কিন্তু তারা অধিকাংশই বিভিন্ন উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। জাতিবাদের সম্যক ধারণার জন্য তাদের এক ও অভিন্ন প্রেরণার প্রয়োজন ছিল। পয়গম্বর, আল্লাহ্‌কে, জাতীয় ঐক্যের কেন্দ্রীভূত সত্তা রূপে আনালেন এবং চাইলেন যে আরবরা, যারা আরব নয় তাদের সাথে নির্দয়ভাবে **যুদ্ধ করে তাদের সম্পত্তি, জমি, নারী ও সন্তান সব অধিকার করে নিক এবং সাফল্যের** স্বাদ পাক। যেহেতু পয়গম্বরের সময়ে এমন মুসলিম প্রায় ছিলই না, যারা আরব নয়, তাই 'আরব' আর 'মুসলিম' সমার্থক ছিল, এবং ইসলামের নামে তাদের সহজেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা যেত। কারণ ইসলামের এক অলৌকিক আবেদন ছিল— স্বর্গের প্রতিশ্রুতি।

আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের ঘৃণা করেন, কারণ তারা তাঁকে তাদের ঈশ্বর বলে স্বীকৃতি দেয় না, বা পূজাও করে না। কোরাণ-অনুযায়ী আল্লাহ্ নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি কর্তা। তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অবিসংবাদী, স্বনির্ভর এবং সকল বাসনার ঊর্দ্ধে। এইসব দৈব গুণগুলি কাল্পনিক কারণ কোরাণের বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ্ **স্বীকৃতি, ভালবাসা এবং পূজার জন্য পাগল। সরল সত্য হল এই যে আল্লাহ্ মানুষের দ্বারা আরাধিত হলে সুখী হ'ন এবং মানুষের অবজ্ঞায় অসুখী হয়ে থাকেন। এইজন্য তিনি অবিশ্বাসীদের কঠোরভাবে ভর্ৎসনা করেন এবং নরকের ভয় দেখিয়ে থাকেন। যখন এই কৌশলে কাজ হয় না তখন স্বর্গীয় সুধার প্রলোভন দেখান। আল্লাহ্ কী ধরণের ঈশ্বর যাঁর নিজের সুখ তাঁর প্রতি মানুষের আচরণের উপর নির্ভর করে?** তিনি কখনোই স্বনির্ভর বা সার্বভৌম হতে পারেন না। কারণ তাঁর মধ্যে পূজা পাবার প্রচণ্ড বাসনা কাজ করে। যদি সত্যিই ঈশ্বর পূজা পেতে আগ্রহী তো তিনি বশংবদ ও বাধ্য মানুষের সৃষ্টি করতেন। এর সহজ অর্থ হ'ল যে হয় ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা নন, নয় তিনি ভক্তি চান না।

পূজা পাবার আকাঙ্ক্ষা কী সত্যিই মহৎ? বাস্তবিকই এটি অতি হীন আকাঙ্ক্ষা কারণ এটি একটি নিকৃষ্ট মানের স্তাবকতা। যে সবসময়েই প্রশংসা পেতে চায়, সে একজন বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি, যে সব পরিমিতিবোধ হারিয়েছে। এটা তার আত্মমর্য্যাদা এবং যাদের কাছে সে সভয় নতিস্বীকার আকাঙ্ক্ষা করে তাদের আত্মসম্মানের পক্ষেও ক্ষতিকর।

প্রশংসার আকাংক্ষা একটা মানবিক দুর্বলতা, কর্তৃত্বের প্রবণতাই এর উৎস। 'ট্যাক্সেশন অ্যানড্ লিবার্টি" ও 'ইটারনিটি', এই দুটি বইতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষেপে, এর অর্থ, নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে, অপরের হীনম্যতার সুযোগ নিয়ে তাদের উপর কর্তৃত্ব করা। এটি পাখীদের খাদ্য গ্রহণের ক্রমপর্য্যায়ের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন যুগে ভূস্বামীর সামনে সাষ্টাঙ্গে নতি জানানো, বাদী বা ফরিয়াদির সনির্বন্ধ আবেদনের একটি অঙ্গ ছিল। এটি প্রভুর কর্তৃত্ব স্পৃহাকে তৃপ্ত করতো। প্রশংসা, আসলে প্রভুর সামনে আত্মাবমাননারই এক রূপ। অবশ্য প্রভু তাঁর অধস্তনকে প্রশংসা করতে পারেন, কিন্তু তাকে পূজা বলে না।

আল্লাহ্ মহম্মদের সৃষ্টি, তিনি একটি অবয়বহীন ধারণামাত্র, তাঁর কোনো বাস্তব রূপ নেই। "প্রত্যাদেশ"এর কৌশলই নবীকে ঈশ্বরের নামে ঈশ্বরের কাজ করবার ক্ষমতা দেয়। যে ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে নেই কিন্তু তিনি আছেন এই ধারণার সৃষ্টি করা হয়, যাতে নবী দেখাতে পারেন যে তাঁর কোনো স্বার্থ নেই। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা ঠিক উল্‌টো। আসলে যাজক বা নবী ঈশ্বরকে সামনে রেখে নিজেই সর্বময় কর্তা হয়েছেন।

মহম্মদ প্রকৃত কার্য্যকর্তা। আল্লাহ্ শুধুমাত্র সাজানো পুতুল। এর সাথে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের মিল আছে। রাণী হচ্ছেন শুধুই লোকদেখানো কর্তৃত্বের অধিকারিণী, প্রকৃত পক্ষে প্রধানমন্ত্রীই তাঁকে নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে। মহম্মদই মানুষের ভালবাসা ও পূজা চান এবং সেই জন্যই তিনি, তাঁকে যারা বিশ্বাস করে না, তাদের সহ্য করতে পারেন না। কোরাণে একথা স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে।

> "আল্লাহ্ নবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর ফেরেশ্‌তাগণও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে বিশ্বাসিগণ। তোমরাও নবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং তাকে উত্তমরূপে অভিবাদন কর।"

(কন্‌ফেডারেট্‌স্-সূরা আহ্যাব : ৫৬)

"আশীর্বাদ এবং শান্তির জন্য প্রার্থনা" এই দুটোই উপাসনার প্রধান অঙ্গ। অন্যান্য ধর্মে মানুষ ঈশ্বরের পূজা করে, কিন্তু ইসলাম ধর্মে ঈশ্বরও তাঁর দেবদূত সহ পয়গম্বরের পূজা করেন, তবুও পয়গম্বর নিজেকে মানুষ এবং ঈশ্বরের দাসরূপে দাবী করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে মহম্মদই ইসলামের আসল কার্য্যকর্তা এবং আল্লাহ্ পবিত্র ধারণামাত্র।

যদি মহম্মদ ঘোষণা করতেন যে, যারা তাঁর নামে অথবা আরব জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠার জন্য হত্যা করবে বা নিহত হবে, তাদের তিনি স্বর্গ প্রদান করবেন, তাহলে কেউই তাঁকে বিশ্বাস করতো না। কিন্তু আল্লাহ্র নামে এই ঘোষণা করে, তিনি, যারা আরব নয়, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাঁর সার্বভৌম নেতৃত্বে এক জাতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে, তিনি এক অলৌকিক আবেদনের সৃষ্টি করেছেন। তাদের তাৎক্ষণিক পুরস্কার হ'ল অপরের সম্পত্তিলাভ ও নারীর উপর অধিকার এবং বিদেশীদের উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ। এবং যারা নাস্তিকদের হত্যা করতে গিয়ে, নিজেরা নিহত হ'ল, তাদের জন্য আরো বড়ো পুরস্কার, তারা সবাই সরাসরি স্বর্গলাভ করবে।

এবার সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে সত্যিই কি আল্লাহ্ আছেন এবং কোরাণ তাঁর বাণী না দুটোই মহম্মদের সৃষ্টি।

সন্দেহ নেই যে দুটোই পয়গম্বরের জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গীভূত এবং প্রাচীন সেমিটিক-পদ্ধতির প্রত্যাদেশের সাথে যুক্ত এক ব্যাপক সংযোজন। এর অনেক কারণ আছে যার কয়েকটি আলোচনা করা হবে।

প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে ঈশ্বরের আইন সর্বজনীন এবং নিরপেক্ষ। প্রকৃতির নিয়মে কোনো দ্বৈতভাব বা পক্ষপাতিত্ব নেই। এই কারণেই পরিমাপ নির্ধারিত, গতি পরিমিত, পদ্ধতিগুলিও পরিকল্পিত। যথা যদি জল তৈরী করতে হয় তো, বিশেষ পদ্ধতিতে দুভাগ হাইড্রোজেনের সাথে একভাগ অক্সিজেন মিশ্রণ করতে হবে। এর পরিমাপ ও পদ্ধতির হেরফের করা যাবে না।

পয়গম্বর কোরাণকে ঈশ্বরের কথা বা আইন বলে প্রয়োগ করেছেন এবং তা সেইরকম অপরিবর্তনীয় বলে ঘোষণা করেছেন

"আল্লহ্র বাণী কোনও মানুষ বদলাতে পারে না।"

(ক্যাট্ল্ : ৩০)

যাইহোক এই দাবী ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত নয়। কার্যক্ষেত্রে পয়গম্বর ঈশ্বরের নিয়মেরও উর্দ্ধে ঃ—

১। কিব্লার উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। যদি আল্লাহ্ সর্বময় কর্তা হন তবে মৌলিক বিষয়গুলিতে পয়গম্বরের কোনো বক্তব্য থাকার কথা নয়। যদি তিনি

ইসলামের স্রষ্টা হন, তবেই তিনি কোনো পরামর্শ দিতে পারেন বা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

২। কোরাণ বিবাহবন্ধনের বাইরে কোনো যৌন সম্পর্ক অনুমোদন করে না, কিন্তু আমরা দেখি মুসলিমরা উপপত্নী রাখে যাদের সাথে তারা ইচ্ছামতো যৌন সম্পর্ক করে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে পয়গম্বরের অন্ততঃ একটি উপপত্নী ছিল, যদিও কেউ কেউ বলে যে তার সংখ্যা দুটিও হতে পারে।

৩। কোরাণ একসাথে চারটির বেশী পত্নী অনুমোদন করে না, কিন্তু নবীর একসাথে ৯টি পত্নী ছিল। অবশ্যই পয়গম্বর আল্লাহ্‌র আইনের উর্দ্ধে অথবা আল্লাহ নিজেই পয়গম্বরের সৃষ্টি।

৪। বহুবিবাহ অনুমোদিত যদিচ কঠোর ভবে সাম্যের অনুশীলনে আবদ্ধ। অর্থাৎ স্বামী তার সকল স্ত্রীর সাথে সমান আচরণ করবে।

"বিবাহ করবে (স্বাধীনা) নারীদের মধ্যে, যাকে তোমাদের ভাল লাগে, দুই, তিন অথবা চার, আর যদি আকাংক্ষা কর যে সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে..."

(উইমেন-সূরা নিসা ঃ ৩)

যখন পয়গম্বরের পত্নীরা তাঁদের অতৃপ্তি প্রকাশ করতে লাগলেন, কলহ বিবাদ শুরু করলেন ও দুর্বাক্য ব্যবহার করতে লাগলেন, তখন, আল্লাহ্ তাঁকে বহুবিবাহের এই গুরুত্বপূর্ণ শর্ত থেকে অব্যাহতি দিলেন।

"তুমি ওদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তোমার নিকট হতে দূরে রাখতে পার এবং যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার এবং তুমি যাকে দূরে রেখেছ তাকে কামনা করলে তোমার কোন অপরাধ নেই।"

(দ্য কন্‌ফেডারেট্‌স্ - সূরা আহ্য়াবঃ ৫১)

স্পষ্টতই ঈশ্বরের আইন মহম্মদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ তিনি তা সৃষ্টি করেন ও পরিবর্তন করেন নবীর প্রয়োজন বা সুবিধা অনুযায়ী।

৫। কোরাণ বলে যে সব ন্যায়পরায়ণ ও ধর্মবিশ্বাসী মহিলাই বিবাহযোগ্যা এবং ধর্মবিশ্বাসী পুরুষের তাদের বিবাহ করা উচিত। সেই ধার্মিক মহিলাদের পিতার ধর্ম বিবাহের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু পয়গম্বরের কন্যা ফতিমার স্বামী,

আলি, যখন আবু জাহ্ল এর কন্যাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল, তখন আল্লাহ্র নিয়ম এখানে খাটলো না। পয়গম্বর এ বিবাহে সম্মত হলেন না যদিও আল্লাহ্ বহু বিবাহ অনুমোদন করেন এবং মহিলাটিও ইসলামে বিশ্বাসী। একথা নিশ্চিত যে আলি পুণ্যবান এবং ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ছিল, এবং মেয়েটিও নিশ্চয়ই ন্যায়পরায়ণা ছিল। যদিও মেয়েটির পিতা নাস্তিক এবং ইসলামের শত্রু ছিল তবুও এই বিষয়ে এর কোনো প্রভাব পড়ার কথা নয়। তাহলে পয়গম্বরের বিরোধী মনোভাবের কারণ কী?

যাজকের আসন থেকে পয়গম্বর ঘোষণা করলেন, "আলির উচিত আমার মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা, কারণ আমার কন্যা আমারই অংশ। যে তাকে বিব্রত করে এবং যে তাকে অসম্মান করে, সে আমারই অসম্মান করে।"
(সাহী মুসলিম হাদিস্ ৫৯৯৯)

বিস্ময় জাগে কোরাণের দাবীতে—

"কোনো মানুষ ঈশ্বরের বাণী পরিবর্তন করতে পারে না।"

৬। ইসলামপূর্ব সময় থেকেই মক্কা, পবিত্রস্থানের মর্য্যাদা পেয়ে আসছে। এমনকি মূর্ত্তি উপাসকরাও এই প্রথা মেনে এসেছে। কোরাণ মক্কাকে "সকল নগরীর মাতারূপে" স্বীকৃতি দিয়েছে তার ধর্মীয় মর্য্যাদা অনুসারে। কিন্তু দশহাজার লোক নিয়ে পয়গম্বর মক্কা আক্রমণ করেছিলেন, সেই পবিত্র নগরীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে।

সাহী আল্ বুখারির ৯ নং পরিচ্ছেদের ৫৯ নং হাদিস নবীর বক্তব্য জানিয়েছে—
"আল্লাহ্ মক্কাকে এক পবিত্র স্থানরূপে সৃষ্টি করেছেন। আমার পূর্বে তা পবিত্র ছিল এবং আমার পরেও তা পবিত্র থাকবে। আমার জন্য তা (অর্থাৎ পবিত্র নগরীর উপর হামলা) দিনের কয়েক ঘন্টার জন্য আইনসম্মত করা হয়েছিল।"

মক্কা এত পবিত্র যে কেউ তার ঝোপঝাড়ও উপড়ে ফেলার অনুমতি পায় না, সেখানকার গাছ কাটতে পারে না অথবা পশুকে তাড়া করতে বা শিকার করতে পারে না বা পড়ে থাকা কোনো জিনিষ তুলতে পারে না।

ইতিহাস বলে যে মক্কাবাসীরা নবীর কাছে নতি স্বীকার করে রক্তপাত এড়িয়ে গিয়েছিল। যদি তারা বাধা দিতো তবে আল্লাহ্, যতদিন না পয়গম্বর জয়ী হন, ততদিন সময় অনুমোদন করতেন। বিস্ময় লাগে যে আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বজনীন আইনগুলিকে

পরিবর্তন করেন বা ত্যাগ করেন, মহম্মদকে খুশী করবার জন্য। তাঁকে দেখে মনে হয় যে তিনি পয়গম্বরের ক্রীতদাস এবং অপেক্ষা করে আছেন কখন তাঁকে একটু খুশী করতে পারবেন।

সাহী আল্‌বুখারীর তিরিশ নম্বর পরিচ্ছেদের ৪৮ নং হাদিস্ বলে যে, যে সমস্ত মহিলা নবীর কাছে নিজেদেরকে বিবাহের নিমিত্ত নিবেদন করেছিলেন, তাদের মধ্যে একজনকে — খাউলা বিন্‌ট হাকিমকে — উদ্দেশ্য করে নবীর কনিষ্ঠতমা পত্নী আইষা বলেছিলেন — "একজন পুরুষের কাছে নিজেকে নিবেদন করার জন্য মহিলাটির কী লজ্জাবোধ হয় না।"

কিন্তু যখন শীঘ্রই এক প্রত্যাদেশ আসে যে ঃ "(মহম্মদ) তুমি তোমার ইচ্ছামতো, তোমার যে কোনো স্ত্রীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারো ...." (৩৩ ঃ ৫১), তখন আইষা বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্‌র দূত তোমাকে খুশী করার জন্য তোমার প্রভু অত্যন্ত ব্যাকুল, এছাড়া তো আমি আর কিছু দেখি না।"

কী অর্থবহ উক্তি? মনে হয় আল্লাহ্‌র একমাত্র কাজ মহম্মদের প্রীতি বর্দ্ধন, তা সত্ত্বেও তাঁর দাবী যে তিনি সৃষ্টিকর্তা এবং সর্বশক্তিমান্। তা তিনি হতেই পারেন না। আল্লাহ্ মহম্মদেরই সৃষ্টি এবং তাঁর কর্তব্য হল মহম্মদের কথা এবং কাজকে এক অলৌকিক পবিত্রতা প্রদান করা।

এটাই মানুষকে বিশ্বাস করতে শেখালো যে "জেহাদ", অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে অমুসলিমদের হত্যা ও লুণ্ঠনের পুরস্কার স্বর্গ, যা সকল মানুষের স্বপ্ন। এই ধরনের পুরস্কারের প্রত্যাশা না থাকলে আরবরা অতখানি উৎসাহের সাথে যারা আরব নয়, তাদের নিঃশেষে ধ্বংস করবার জন্য লড়াই করতে পারতো না। নতুন কোনো ধারণা না হলেও, স্বর্গ ছিল পয়গম্বরের জাতীয় পরিকল্পনার অঙ্গ। একে এতো কাব্যিক ভাবে, কৌশলের সাহায্যে অবতারণা করা হয়েছিল যে চোদ্দশো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কেউ একে টেক্কা দিতে পারে নি।

স্বর্গ কী ?

এ এমন এক জায়গা, যা আরবদের মনোমত, কারণ তারা প্রচণ্ড গরম মরুপ্রদেশ, যেখানে বলতে গেলে গাছপালা, জল, কিছুই নেই, সেখানে থাকার কষ্ট অনুভব করেছে। প্রচণ্ড দাবদাহ, ক্ষুধা এবং বিপজ্জনক পরিবেশ তাদের এক যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা

দিয়েছে, তাই তারা ছায়াময় এবং ঝর্ণা, কূপ ইত্যাদি শীতল জলের উৎসময় পরিবেশে থাকতে উৎসুক। তাই কোরাণ স্বর্গকে এভাবেই বর্ণনা করেছে ঃ

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের শুভ সংবাদ দাও যে তাদের জন্য রয়েছে স্বর্গ, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, যখনই তাদের ফলমূল খেতে দেওয়া হবে....."

(দ্য কাউ-সূরা বাকারাহ্ ঃ ২৫)

এ থেকেই আরবদের জীবনে ইসলামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা যায়। একই বিষয় "থাণ্ডার ঃ ৩৫" এবং "দ্য স্পাইডার ঃ ৫৫" তে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। পরে ক্রমশ: আরো অনেক স্বর্গীয় আনন্দের সম্ভার সম্বন্ধে আনন্দ সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে।

"তাদের জন্য আছে নির্ধারিত জীবনোপকরণ —ফলমূল এবং তারা হবে সম্মানিত, সুখদ কাননে তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন হবে। তাদের ঘুরে ঘুরে পরিবশেন করা হবে বিশুদ্ধ সুরা, শুভ্র উজ্জ্বল পাত্রে, যা হবে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ওতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং ওতে তারা মাতালও হবে না। তাদের সঙ্গে থাকবে লজ্জা নম্র, আয়তলোচন তন্বিগণ।"

(দ্য রেঞ্জার্স-সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ৪১-৪৮)

"দ্য অল্ মার্সিফুল ঃ ৫৫", স্বর্গকন্যা বা হুরীদের বর্ণনা করেছে ঃ

"সেখানে থাকবে আয়তনয়না তরুণীগণ, যাদের পূর্বে মানুষ অথবা জ্বিন্ স্পর্শ করে নি—প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ এ সকল তরুণী"

(দ্য অল্ মার্সিফুল্ সূরা রাহ্‌মান ঃ ৫৬, ৫৮)

এখানে স্বর্গ সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই স্থানটিতে তরমুজ ও খেজুর গাছের প্রাচুর্য্য রয়েছে, সর্বত্র সুন্দরী কুমারী বা হুরীরা নির্জন, শান্ত পরিবেশে বিচরণ করে। তারা সবুজ গালিচায় বিশ্রাম করে মদিরার পাত্র হাতে। এই স্বর্গ এক সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকায়, প্রবহমান ঝর্ণার কূলে অবস্থিত।

"দ্য স্মোক ঃ ৫০", ঘোষণা করে যে মুসলিমদের সাথে সেইসব আয়তনয়না হুরীদের বিবাহ দেওয়া হবে। স্বর্গের চমৎকারিত্ব বেড়ে যায় "মহম্মদ ঃ ১৫"তে।

"ওতে আছে নির্মল জলের নদী, আছে দুধের নদী যার স্বাদ অপরিবর্ত্তনীয়, আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুধার নদী, আছে পরিশোধিত মধুর নদী এবং সেখানে ওদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল..."

(সূরা মোহাম্মদ ঃ ১৫)

পয়গম্বরের বর্ণনার চমৎকারিত্ব অসাধারণ। স্বর্গের আনন্দকে নরকের কষ্টের পরিপ্রেক্ষিতে রেখে তিনি অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। সেই 'সূরা'তেই তিনি জানিয়েছেন যে নরকের বাসিন্দারা অর্থাৎ অমুসলিমদের "ফুটন্ত জল পান করতে দেওয়া হবে, যা তাদের অন্ত্রগুলিকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে"। "মাউন্ট ২০" তে স্বর্গের বাসিন্দাদের জন্য আরও আকর্ষণীয় ব্যবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে "লুকানো মুক্তোর মতো তরুণেরা" সেবা করবে। এই অমর সুকুমার বালকগুলির একটি কাজ হল মুসলিমদের পানীয় দেওয়া এবং ফল ও পাখীর মাংস খেতে দেওয়া, যেমনটি তারা চায়। এই সেবা কার্য্যে তাদের সঙ্গ দেবে "লুকানো মুক্তোর মতো সুন্দরী হুরীরা"। এটাই তাদের কাজের জন্য পুরস্কার।

স্বর্গের স্বাদ সম্বন্ধে জানিয়ে আল্লাহ্ নরকের যন্ত্রণার বর্ণনা করেন, যাতে স্বর্গের আকর্ষণ আরো বেড়ে যায়।

"তোমরা যারা ভুল পথে চলে মিথ্যা ভাষণ করেছিলেন তাদের (কন্টকময়) জাকৌম গাছের ফল খেয়ে পেট ভরাতে হবে এবং তৃষ্ণার্ত্ত উষ্ট্রের মত জলপান করতে হবে যে জল হবে ফুটন্ত গরম, ধ্বংসের দিনে আপ্যায়ন করা হবে এই ভাবেই।"

(দ্য টেরর্ ঃ ৫০)

"ম্যান ঃ ১৫" তে স্বর্গের আরো বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এখানে একটি ফোয়ারা বা ঝর্ণা আছে, যার নাম "সালসাবিল", যার থেকে আদ্রক যুক্ত পানীয় (ginger wine) পাওয়া যায়। অমর তরুণেরা "ছড়ানো মুক্তোর মতো" ঘুরে বেড়ায় এবং রৌপ্য ও স্ফটিক নির্মিত পানপাত্রে পানীয় পরিবেশন করে। তারা দৃষ্টিনন্দন, সবুজ রেশম ও ব্রোকেডের পোষাক ও রূপার অলঙ্কার পরে থাকে। তাদের মধ্যে বিশাল সাম্রাজ্যের রাজকীয় মহিমা প্রকাশিত হয়।

সুন্দরী কুমারী কন্যা বা হুরীদের বর্ণনা শেষ অবধি পাওয়া যায়। এই উন্নতবক্ষ সুরসুন্দরীরা বিশ্বাসীদের হাতে পূর্ণপাত্র তুলে দেয়।

এবারে হাদিস্ থেকে (জামে টার্মিজি ঃ ২য় খণ্ড; পরিচ্ছেদ — "স্বর্গের নারীরা"; পৃঃ ১৩৫-১৪০; চিত্রিত)

হুরীদের বর্ণনা ঃ

১। হুরীদের শরীর এতো স্বচ্ছ, যে তাদের অস্থিমজ্জাও দেখা যায়।

২। তাদের হুরী বলা হয় কারণ তাদের রং অত্যন্ত শুভ্র ও স্বচ্ছ এবং দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তাদের কৃষ্ণবর্ণ আয়তলোচন, হরিণের কথা মনে করিয়ে দেয়।

৩। তাদের চোখ নত এবং সংযত।

৪। হুরীর শরীর স্বচ্ছ পানপাত্রে লাল পানীয়ের মতো।

৫। হুরীরা মিষ্টভাষিণী ও তাদের সহচরদের ভালবাসে।

৬। তারা কুমারী এবং কষ্ট অনুভব করে না।

৭। তাদের বক্ষোদেশ বর্তুল এবং সমান্তরাল এবং অনম্র।

৮। তারা প্রাসাদে থাকে।

৯। পয়গম্বর বলেন — প্রত্যেক মুসলিমকে শতসংখ্যক সমর্থমানুষের ক্ষমতার সমতুল্য পৌরুষ প্রদান করা হবে।

১০। মুসলিমরা বিশ্বাস করে যে প্রত্যেকটি অনুগতজনকে স্বর্গে সত্তরটি করে হুরী ও বেশ কিছু সংখ্যক সুন্দর তরুণ প্রদান করা হবে। স্বর্গের প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এই স্বর্গে স্থান পাবার জন্য প্রত্যেককে ধর্মযুদ্ধে (জেহাদ) অংশগ্রহণ করতেই হবে।

"তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল। যদিও এ তোমাদের কাছে অপছন্দ; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর সম্ভবতঃ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ্ জানেন, তোমরা জান না।"

(দ্য কাউ — সূরা বাকারাহ্ ঃ ২১৬)

"হে নবী! বিশ্বাসীদের সংগ্রামের জন্য উদ্বুদ্ধ কর, তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্য্যশীল থাকলে তারা দুশো জনের উপর বিজয়ী হবে...."

(দ্য স্পয়েল্স্ — সূরা আন্ফালঃ ৬৫)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ্ বেহেশ্তের মূল্য বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন, তারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, (অসৎ ব্যক্তিদের) নিহত করে অথবা (নিজেরা) নিহত হয়। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন...."

(রিপেন্ট্যান্স্ – সূরা তওবা ঃ ১১১)

স্বর্গলাভের জন্য, প্রত্যেক ধর্মভীরু মুসলিমকে কাফের বা অমুসলিমদের ধবংস করতে হবে;এটাই জেহাদ। এটাই ইসলামে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা;এবং যে ব্যক্তি জেহাদে অংশ নিতে চায় না, সে মুসলিমই নয়।

মোল্লারা দাবী করে যে "জেহাদ" আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ। এটা মৌল ইসলামিক নীতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে। কিছু পংক্তি অবশ্যই আছে এর সপক্ষে, কিন্তু ইসলামের ইতিহাস তা সমর্থন করে না। ইরান, মিশর ও ভারতের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধ মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের। অবশ্য যখন পয়গম্বরের লড়াই করার ক্ষমতা ছিল না, তখন মক্কার অধিবাসীরা তাঁর উপর নির্যাতন করেছে। এইসব তথাকথিত আত্মরক্ষামূলক পংক্তিগুলি আগেকার মুসলিমদের সংযত এবং আত্মরক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী নেবার আবেদন জানায় শুধুমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং কিছু সময়ের জন্য।

জেহাদ এক আক্রমণাত্মক যুদ্ধ কারণ এর সাহায্যে অমুসলিমদের হত্যা, লুণ্ঠন এবং নারীহরণের মধ্যে দিয়েই মুসলিমদের কর্তৃত্ব অর্জন করতে হবে। ইসলাম কাফেরদের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়।

"আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য আদিষ্ট যতদিন না তারা স্বীকার করে নেয় যে আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই এবং আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে যে আমিই ঈশ্বরের দূত এবং আমি যা বহন করে এনেছি, সেই কোরাণে বিশ্বাস করে। এবং যখন তারা তা করবে, তাদের রক্ত (প্রাণ) এবং ধন সম্পত্তির সুরক্ষা আমার কাছ থেকে পাবে যদি তা আইন দ্বারা সমর্থিত হয়।" (সাহী মুসলিম ঃ হাদিস্ ঃ ৩১) যদি "আল্লাহ্"'র অর্থ বিশ্বজনীন ঈশ্বর হয়, তবে ইহুদী, খ্রীশ্চান, হিন্দু ইত্যাদি সবাই সবসময় তাঁকে বিশ্বাস করে এসেছে। **অতএব ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে কোনো বিবাদ নেই, বিবাদ মহম্মদকে নিয়ে যিনি সাম্রাজ্যবাদী আরব জাতির শীর্ষ নেতারূপে ঈশ্বরের মতো উপাসিত হতে চেয়েছেন।** প্রত্যাদেশজনিত মতবাদ এক উপায় যার সাহায্যে

একজন মানুষ অর্থাৎ নবী পরোক্ষে ঈশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ্ এবং তাঁর দেবদূতেরা মহম্মদের কাছে শান্তি প্রার্থনা করে, অতএব তাঁর (মহম্মদের) ভালবাসা এবং ভক্তি পাবার অসীম ইচ্ছা সহজেই অনুমেয়।

তাঁর দেশবাসীকে বিশ্বজনীন সত্তা সম্বলিত এক জাতীয় ঈশ্বর অর্থাৎ আল্লাহ্, একটি পবিত্র গ্রন্থ এবং এক পয়গম্বর (অর্থাৎ নিজেকে) প্রদান করার পর তিনি তাদের এক দুর্জয় যোদ্ধার জাতিতে পরিণত করতে চাইলেন। তাঁর জেহাদ সম্বন্ধীয় মতবাদ, যা স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দেয়, এই প্রসঙ্গে এক অভূতপূর্ব দূরদর্শিতার নিদর্শন। আরব ধর্মযোদ্ধারা তাদের **বিরুদ্ধপক্ষীয়দের** পরাজিত করে তাদের ধন সম্পত্তি এবং নারী লুণ্ঠন করে এ জীবনেই স্বর্গের স্বাদ পাবে অথবা, যদি তারা নিহত হয়, তবে তারা স্বর্গীয় হুরীদের সাদর আলিঙ্গন লাভ করবে, কোনোদিকেই তাদের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই।

৬২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন পয়গম্বর মদিনাতে দেশান্তরী হলেন, তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল লুণ্ঠনের জন্য একটি লড়াকু এবং শক্তিশালী দল তৈরী করা। তাঁর সামরিক মর্য্যাদাই তাঁকে আরবদের উপর কর্তৃত্বের ক্ষমতা এনে দিয়েছিল এবং তাঁর বক্তব্যকে বিশ্বাসযোগ্যতা দিয়েছিল।

তাঁর নবীত্ব পরিগ্রহণের প্রথম তেরো বছর তিনি অনধিক সত্তর জনকে তাঁর মতবাদে এবং পথে এনেছিলেন। অন্যান্য শত্রুভাবাপন্ন উপজাতিরা তো বটেই, কুরেশ, তাঁর নিজের জনগোষ্ঠীও, তাঁর উপর খড়গহস্ত ছিল এবং অত্যাচার করতেও ছাড়েনি এবং অন্যান্য বিরোধী গোষ্ঠীর সাথে মিলিত হয়ে পরিকল্পিত ভাবে তাঁকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিল। মহম্মদ বুদ্ধিমান ও বীর ছিলেন এবং সঠিক সময়ে সঠিক কাজ করবার ক্ষমতা রাখতেন। যখন তিনি মক্কায় ছিলেন, তখন জেহাদের বাণী প্রচার করবার পক্ষে ক্ষমতার দিক দিয়ে, দুর্বল ছিলেন, কিন্তু যখন তিনি মদিনায় এলেন, তখন, নাটকীয়ভাবে না হলেও তাঁর অনুগামীর সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করলো। তেরো বছরে সত্তর জন শিষ্য এমন কিছু সাফল্যের কাহিনী নয়। মহম্মদের মতো ব্যক্তি, যাঁর ইচ্ছাশক্তির প্রাচুর্য্য ছিল, এবং এমন একটি জাতি গঠনের স্পৃহা ছিল, যে জাতি বাইজ্যানটাইন এবং ইরানীদের দমিয়ে রাখতে পারবে, তাঁর পক্ষে এই ধরণের অগ্রগতি খুবই দুঃখজনক ছিল। এখনকার মতো সেই সময়েও বিভিন্ন জাতিরা ক্ষমতার দ্বারা বশীভূত হত, নম্রতার দ্বারা নয়। জন্মসূত্রেই তিনি ছিলেন ধর্মযোদ্ধা এবং নেতা। যেমন ইহুদীরা ক্যানানাইটদের, তরবারি এবং অগ্নির সাহায্যে অবদমন করেছিল, তেমনি

অভূতপূর্ব উৎসাহের সাথে পয়গম্বর তাঁর যুদ্ধের ক্ষমতা প্রদর্শন করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। জেহাদ, যা আল্লাহর নামে লুন্ঠন করার লড়াই, তা পবিত্রতম কর্তব্যরূপে ঘোষিত হ'ল। সাফল্য, এই পার্থিব জীবনকে স্বর্গীয় করে দেয়, যখন মুজাহিদ বা ধর্মযোদ্ধা তার লুন্ঠিত সম্পদের সাহায্যে জীবনকে উপভোগ করে এবং অপহৃত নারীদের নিয়ে হারেম তৈরী করে তাদের সাহচর্য্যে সর্বদুঃখহর আনন্দ এবং প্রশ্রয়পূর্ণ সান্নিধ্য উপভোগ করে থাকে। এবং যদি ধর্মযোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় তবে তারা আরও ভাগ্যবান কারণ তারা সোজাসুজি স্বর্গে যাবে। সেই স্বর্গ যা আল্লাহর আনন্দ, দান এবং দয়ার প্রকাশ।

কিছু দেশান্তরী লোকেরা স্থানীয় বাজারে দালালী করতে শুরু করলো, অন্যরা "রাজিয়া" বা "গাজওয়া" অর্থাৎ লুন্ঠন অভিযান এবং বেদুইন জীবনযাত্রা শুরু করলো মদিনায় এসে। মদিনায় দশবৎসরব্যাপী অবস্থানের সময় পয়গম্বর ৬৫টি এই ধরণের অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং নিজে অনধিক সাতাশটিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ৬২৪ সালের জানুয়ারী মাসে ছোট্ট একদল লোককে মক্কার কাছে নাখ্‌লায় পাঠানো হয়েছিল, ইয়েমেন থেকে আসা এক ক্যারাভান (বা উটের শ্রেণী)কে আক্রমণ করবার জন্য। তারা এই অভিযানে সফল হয়েছিল। কিন্তু মূর্তি উপাসকরা মুসলিমদের ঔদ্ধত্য দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল কারণ মুসলিমরা মক্কার প্রথাগত পবিত্রতা নষ্ট করেছিল। আবার ৬২৪ সালের মার্চমাসে ৩১৫ জনের এক দলের নেতারূপে পয়গম্বর, মক্কা থেকে আগত এক সম্পদশালী ক্যারাভানকে আক্রমণ ও লুন্ঠন করেন। এই ক্যারাভানের নেতৃত্বে ছিলেন 'উমাইয়া' উপজাতির নেতা আবু সুফিয়ান । আবু সুফিয়ান কৌশলে মহম্মদকে ফাঁকি দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু আবু জাহ্‌ল, আটশো লোকের এক সাহায্যকারী দল নিয়ে মহম্মদকে শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ১৫ই মার্চ, ৬২৪ সালে 'বদর' এর যুদ্ধে মহম্মদের সুনিশ্চিত জয় হল এবং এই জয় তাঁকে সামরিক মর্য্যাদা এবং নবীরূপে বিশ্বাসযোগ্যতা এনে দিল। মহম্মদের নিজস্ব এক অস্ত্রসজ্জা ছিল, এবং তিনি নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। এইসব ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব বীরত্ব ও দৃঢ়তার সাহায্যে জয় লাভ করেন। একমাত্র উহুদ্‌ এ তিনি পরাজিত হন এবং সেটাও তাঁর সাহসের অভাব বা সামরিক পরিকল্পনার অভাবজনিত পরাজয় নয়। এটা ছিল তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বা অবাধ্যতার ফল।

মদিনা বাসের দশ বৎসরের মধ্যেই ৬৫টি আকস্মিক আক্রমণের পরিকল্পনা, ২৭টিতে নেতৃত্ব দেওয়া, পয়গম্বরের নিজের অনুগামীদের যোদ্ধৃ জাতিতে পরিণত

করার আকাংক্ষার নিদর্শন। এর ফলশ্রুতি স্বরূপ ৬৩০ সালের শেষদিকে তিরিশ হাজার যোদ্ধা নিয়ে তিনি সিরিয়াতে এক লুণ্ঠন অভিযান চালান। এই আক্রমণের সময় তাঁর অনুগামীদের জন্য তিনি সন্ধি ও চুক্তির আদর্শ স্থির করেন। তাঁর রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলই তাঁকে আরব সম্রাটের মর্য্যাদায় উন্নীত করে। কর্তৃত্বের এই সর্বোচ্চ স্তর থেকেই তিনি আরব জাতির নবনির্মাণ করেন, যা তাদেরকে তাঁর মনোমত লক্ষ্যপূরণের যোগ্য করে তুলতে পারে। তিনি তাঁর দেশবাসীকে এমন এক চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রদান করেছিলেন, যা একমাত্র কোনো উচ্চস্তরের সমাজসংস্কারক বা দেশপ্রেমিক করতে পারে। তাঁর মহত্ত্বাকাংক্ষার প্রমাণস্বরূপ তিনি আরবজাতিকে এমন এক উন্নত স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন, যে তারা ক্ষমতাশালী বাইজ্যানটাইন ও ইরাণী শক্তিকে অবদমিত করতে পেরেছিল। এবং এ সমস্তই তাঁর মৃত্যুর বিশবছরের মধ্যে সম্ভব হয়েছিল।

মহম্মদের জাতীয় গুরুত্ব আজও প্রশ্নাতীত রয়ে গিয়েছে, হয়তো ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। আরবদের তিনি যে মহিমা প্রদান করেছিলেন, তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব কমে যাওয়া সত্ত্বেও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য এতটুকুও কমেনি। তার কারণ মহম্মদ 'কাবা'কে পবিত্রতম স্থানের মর্য্যাদা দিয়েছেন, মক্কার পবিত্রতাকে প্রশ্নাতীত গুরুত্ব দিয়েছেন, মক্কায় বাধ্যতামূলক তীর্থযাত্রা বা 'হজ' আরবদের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে সদৃঢ় করেছে, যদি তাদের তৈলসম্পদের কথা ছেড়েও দেওয়া যায়। আরবী কোরাণকে ঈশ্বরের বাণীর মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে। আরবী ভাষাকে দেবতাদের ভাষা বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং আল্লাহকে কাবার একটি মূর্ত্তি থেকে ইসলামের সার্বভৌম ঈশ্বর করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পয়গম্বর নিজেকে মুক্তির একমাত্র মাধ্যম বলে ঘোষণা করেছেন এবং জোর দিয়ে বলেছেন আরবদেশের শত্রু তাঁরও শত্রু। এইভাবে একজন মুসলিমের জীবন পুরোপুরি আরবদের ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের দ্বারা পরিচালিত এবং তার নিজস্ব জাতীয় মর্য্যাদাবোধের পরিপন্থী। এই কারণে যারা আরব নয় এমন মুসলিমরা মানসিক হীনমন্যতায় আক্রান্ত এবং একমাত্র তুর্কীরা ছাড়া আর সবাই জাতীয় পরিচয়ের বিরোধী এবং নিজেদের মুসলিম বলা পছন্দ করে। **জাতীয় চরিত্রের অভাবে এশিয়া এবং আফ্রিকার মুসলিমদের কোনো জাতীয় ইতিহাসই গড়ে ওঠেনি এবং এমন কোনো ঘটনাও পাওয়া যায় না, যা তাদের জাতীয় গর্ব, মর্য্যাদা এবং আত্মতুষ্টি দিতে পারে। এদের অধিকাংশেরই রাজনৈতিক দাসত্বের এক অপমানজনক ইতিহাস রয়েছে।**

ইতিহাসে এক তুলনা পাওয়া যায় ঃ জেরুসালেমের প্রতি ভালবাসার জন্য ইহুদীরা যে সব দেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, তাকে তারা ভালবাসতে পারেনি, কারণ তারা বিশ্বাস করতো যে জেরুসালেম বা ইজরায়েল হল তাদের মাতৃভূমি বা স্বদেশ এবং সেজন্য বাস্তুহারা হবার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ইহুদীদের এই মনোভাব যথার্থ কারণ ইজরায়েলই তাদের আসল দেশ, তারা সবসময়ে সেখানে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে এবং পরবর্তীকালে তারা ফিরে আসতে পেরেছে এবং হৃত মর্য্যাদা ফিরে পেয়েছে।

অন্যদিকে, যারা আরব নয় এমন মুসলিমদের মাতৃভূমি আরব নয়, কিন্তু এই মিথ্যাই তাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য কারণ এটা তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে উদ্ভুত। কিন্তু এটা সত্যি হবে না কোনোদিনই, কারণ আরবরাও তাদের আরব নাগরিক বলে মেনে নিতে পারবে না এবং একশো কোটি মুসলিমকেস্থান দেবার জায়গা বা সামর্থ্য কোনোটাই তাদের নেই।

নিজেকে মুসলিমধর্মের স্তম্ভ স্বরূপ এবং মুক্তির একমাত্র মাধ্যমরূপে দেখিয়ে পয়গম্বর, নিজের, এবং যারা আরব নয় তাদের মধ্যে বহ্নিশিখা ও পতঙ্গের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এই ছোট্ট পোকাগুলি অগ্নিশিখার প্রতি ধাবিত হয় এবং স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করে। বাহিরে থেকে কেউ তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করে না। ভারত, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মুসলিমরা এই সব পতঙ্গের সঙ্গে তুলনীয়।

হাজার বছর আগেও ভারতের অধিবাসীরা সম্পদশালী, বীর ও উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন ছিল। তাদের প্রাচুর্য্য ও সম্পদ বিদেশী লুন্ঠনকারীদের আকর্ষণ করতো। তিনশো বছর ধরে আরব আক্রমকারীদের অগ্রগতি সিন্ধুপ্রদেশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে তারা আর পাঞ্জাব বা ভারতের অন্যান্য অংশে অনুপ্রবেশ করতে পারেনি। এই তথ্য প্রমাণ করে যে ভারতবাসীরা কাপুরুষ ছিল না। পরবর্তীকালে তুর্কীদের বিজয় ভারতে ইসলামের প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করল। ভারতের ধর্মান্তরিত মুসলিমরা, তাদের ভারতীয়ত্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলো। মুসলিমধর্মের প্রভাবে তাদের পূর্বপুরুষের দেশ ভারতকে তারা "দার্-উল্-হারাব" বা একধরণের যুদ্ধক্ষেত্র বা সাময়িক আবাসরূপে ভাবতে শুরু করলো। তারা আরবদেশকে তাদের একান্ত আপন ভেবে মক্কার গুণ গাইতে শুরু করলো। এই আরবপ্রীতি এতো তীব্র হয়ে উঠলো যে তারা, যা কিছু ভারতীয় এবং ভারতের গৌরবের তাকেই ঘৃণা করতে আরম্ভ করলো।

ভারতে অবস্থিত মুসলিম উপাসনা গৃহ গুলিও আরবদেশের উপাসনা গৃহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করতে লাগলো। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাদের তীব্র ঘৃণার ফলে, তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের (যারা মুসলিম ছিল না) প্রতিটি কাজ, তাদের কাছে অবান্তর, তুচ্ছ এবং ঘৃণিত মনে হতে লাগলো। তারা অমুসলিমদের মন্দির ও গীর্জাগুলিকে ধ্বংস করতে চাইলো এবং তাদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' ঘোষণা করলো, যাতে তাদের লুণ্ঠন করে, হত্যা করে ইসলামে ধর্মান্তিরিত করা যায়। নিজেদের সংস্কৃতির প্রতি পরিপূর্ণ অবজ্ঞা ও ঘৃণা, তাদের স্বদেশ, ভারতকে, বিভাজন করতে বাধ্য করলো, যাতে তারা ইসলামিক মূল্যবোধের নামে আরবীয়ত্ব অনুশীলন করতে পারে।

মক্কার প্রীতির জন্য স্বদেশ বিভাজন, স্বেচ্ছায় হীনমন্যতা স্বীকার করা, নিজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি ঘৃণা, সবই পয়গম্বরের প্রদত্ত আরব জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধের ফলশ্রুতি। যারা আরব নয় এমন মুসলিমদের মানসিক দাসত্ব প্রতিদিন আরো তীব্র আকার ধারণ করছে। এর মূল কারণ দারিদ্র্য ও সামাজিক ন্যায়ের অভাব। জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত নিম্নমুখী, কিন্তু তাদের বিশ্বাস যে পয়গম্বরের মধ্যস্থতার ক্ষমতায়, দেরীতে হলেও তাদের আশা পূর্ণ হবে। অর্থাৎ এ জীবনে তারা যা কিছু পায়নি, পয়গম্বরের কৃপায় তারা সেই ক্ষতিপূরণ পেয়ে যাবে যখন তিনি তাদের সামনে স্বর্গের দ্বার খুলে দেবেন এবং হুরীরা তাদের জীবনে সুখ ও আনন্দের বন্যা বইয়ে দেবে।

কাব্যিক হলেও, তাদের ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিই তাদের জীবনের মূল অবলম্বন। এর অভাবে এরা সামাজিক ন্যায় থেকে বঞ্চিত হয়ে, জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম হয়ে শেষ হয়ে যাবে। দুঃখজনক ঘটনা এই যে, যাজক, রাজনীতিক অত্যুৎসাহী ধর্মপ্রবর্তকেরা পয়গম্বরের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেখায় এবং মানুষকে তাঁর উপর আরো বেশী নির্ভরশীল করে তোলে, যাতে সহজেই এদের মগজধোলাই করা যায়। তাহলে সাধারণ লোক আর কোনো কাজে স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে পারবে না। সব থেকে দুঃখের কথা এই যে, এইসব যাজক, রাজনীতিক এবং ধর্ম প্রবর্তকরা সবাই ভণ্ড, এবং নবী ও তাঁর শিক্ষায় বিশ্বাস করে না। কেউ আবার পুরোপুরি নাস্তিক। তাদের কাছে ইসলাম এক উৎকৃষ্ট বিনিময়ের বস্তু যার সাহায্যে তারা যা ইচ্ছা পেতে পারে।

এই মানসিকতা শুধুমাত্র 'স্বদেশে' নয়, বিদেশে, যেখানে যেখানে মুসলিমরা বসবাস করে, সেখানেও দেখা যায়। যেমন ইংল্যাণ্ডে মুসলিমরা "মুসলিম সংসদ"

স্থাপন করেছে, যার অর্থ রাজ্যের মধ্যে আর একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা, যা প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা। যেহেতু ইসলামে সংসদ বা আইনসভার কোনো স্থান নেই, সেহেতু বিশ্বাস করা কঠিন যে তারা সংসদের প্রকৃত অর্থ বা তার বিবর্তনের ইতিহাস জানে। ইসলাম যাজক ও রাজনীতিবিদের মনোভাবকে ব্যক্ত করে, যারা মুসলিম ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে থাকে। বসনিয়া এবং স্পেনে মুসলিমদের যে দুর্দশা হয়েছিল ব্রিটেনেও তারই পুনরাবৃত্তি হবে কারণ মুসলিম সংসদ অনুমোদিত ব্রিটিশ বিরোধী মতবাদ ও কার্য্যকলাপ, বিদেশে বসবাসকারী মুসলিমদের সন্তান সন্ততিদের ব্রিটেনের উদার মূল্যবোধকে গ্রহণ করতে বাধা দিচ্ছে। এইসব ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠছে কিন্তু তাদের মধ্যে এই দেশের প্রতি ভালবাসা বা ব্রিটিশ জাতির প্রতি শ্রদ্ধা গড়ে উঠছে না। ব্রিটেন দেশটা যদি এতোই খারাপ যেমন তারা প্রচার করে চলেছে, তবে এদেশে আসা কেন? যদি যে দেশ থেকে তারা চলে এসেছে, সে দেশ এতোই ভাল এবং দোষ ত্রুটি মুক্ত, তবে নিশ্চয়ই তারা সেখান থেকে পালিয়ে আসতো না। এখন সময় এসেছে এইসব ধর্মব্যবসায়ীদের ভেবে দেখবার যে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তারা তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কী ক্ষতি করে যাচ্ছে।

ব্যক্তি পয়গম্বর, যে কোনো জাতীয় নেতার আদর্শস্থল। সেই আদর্শ অনুযায়ী না চলে তারা তাকে অবজ্ঞা করে চলেছে এবং এরা নিজেদের "মুসলিম" বলে থাকে।

ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আগত এই বিপথগামী মুসলিম যাজক ও রাজনীতিকদের বোঝা উচিত যে পাশ্চাত্য দেশগুলির এক জাগ্রত জাতীয় বিবেক আছে যা আরবী যাদুতে ভুলবে না। এই মুসলিম যাজক ও রাজনীতিকদের তাদের জাতীয় পরিচয় এবং মর্য্যাদাবোধকে পুনরুদ্ধার করবার জন্য সচেষ্ট হওয়ার সময় এসেছে।

এখন, সুন্দরী কন্যা ও সুকুমার বালকে পরিপূর্ণ স্বর্গের স্বপ্ন দেখা হাস্যকর। নিজেদের সুকৌশলে মহিমান্বিত করবার জন্য যে বিদেশী মতবাদ সুপরিকল্পিত উপায়ে সৃষ্টি কবা হয়েছে, তাকে অনুসরণ করতে গিয়ে ভারতীয় মহাদেশের মুসলিমরা নিজের জাতির প্রতি যে অসম্মান, আঘাত এবং অন্যায়, ভোগ করে চলেছে, স্বর্গসুখ তার কোনো বিকল্প হতে পারে না।

ইসলামকে, প্রেম ও সাম্যের আন্তর্জাতিক ধর্ম ও মানুষের সব সমস্যার সমাধান রূপে দেখানো হয়েছে। প্রকৃত সত্য হল এর অধিকাংশ নীতিই ধার করা এবং আধুনিক

জীবনের অনুপযুক্ত। অতএব মুসলিম দেশগুলি এদের মৌখিক স্বীকৃতি দেয় কিন্তু কাজে পাশ্চাত্য নীতিই গ্রহণ করে।

এর পটভূমিকা এবং নীতিগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে ইসলাম প্রকৃতপক্ষে আরবদের একটি জাতীয় আন্দোলন। যা, যারা আরব নয় তাদের উপর আরব সংস্কৃতি ও ধর্মীয় সাম্রাজ্যবাদ সূক্ষ্ম ও কৃত্রিম উপায়ে, সুকৌশলে চাপিয়ে দেয়। ভারত, মিশর ও ইরাণের ইতিহাসই এর প্রমাণ।

ইসলাম, মোল্লাদের জন্য এক বিশাল বাণিজ্যিক সম্পদ এবং রাজনীতিকদের জন্য এক কার্য্যকরী ক্ষমতার উৎস। অতএব উভয়েই এর গুরুত্বকে বাড়িয়ে তুলে, বিরোধীদের নিন্দা করে লাভবান হতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই জন্যই তারা মুসলিম জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং ফতোয়া জারি করে যে বিরোধীরা "কাফির, শাতিম-এ-রসুল এবং ইসলামের অবমাননাকারী।" আসলে এই সুযোগ সন্ধানীরাই ইসলামের শত্রু। এদের অধিকাংশই কোরাণ অনুযায়ী আল্লাহ এবং পয়গম্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। ভণ্ডামীই এদের বিশেষত্ব। এই কপটতার সাহায্যেই তারা অসদুপায়ে লাভবান হয়।

একজন প্রকৃত মুসলিম ধর্মীয় ব্যাপারে হিংসার আশ্রয় নেয় না। কারণ কোরাণ বলে, "ধর্মে দমননীতির কোনো স্থান নেই", এবং আদেশ করে "তোমার বক্তব্য পেশ করো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।" (কাউ-১১১)

এই বইটি এদের আহ্বান জানাচ্ছে। যদি তারা সৎ হয়, তবে তারা নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবে এবং যুক্তির সাহায্যে, তাদের বক্তব্য জানাবে।

আনোয়ার শেখ ঃ জীবনপঞ্জী

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

প্রকৃতপক্ষে আনোয়ার শেখ, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের এক তরুণ প্রজন্ম। অনধিক দুশো বছর আগে তাঁর পূর্বজেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ধর্মের একনিষ্ঠ প্রচারক হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে অধুনা পাকিস্তানে অবস্থিত গুজরাট শহরের সন্নিকটে এক গ্রামে আনোয়ার শেখ-এর জন্ম হয়। তাঁকে ইসলাম ধর্মে পণ্ডিত করে তোলা হয়। এই কারণে তিনি পাকিস্তানের সৃষ্টিতে এক উৎসাহী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশী মুসলিমদের উপর দেশ বিভাগের কুফল প্রত্যক্ষ করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে ইসলামের দ্বিজাতিতত্ত্ব সুযোগসন্ধানীদের কৌশলমাত্র; প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম জাতি বলে কিছু নেই। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিমরা নিজেদের জাতি সম্বন্ধে ততটাই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী, যতটা বিভ্রান্ত ইউরোপ বাসীরা নিজেদেরকে এক অভিন্ন ক্রীশ্চান জাতি ভেবে। এই সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করে আনোয়ার শেখ অবশেষে এই সমাধানে এলেন যে ইসলাম কোনো ধর্ম নয়, এটি আসলে আরবদের জাতীয় আন্দোলন; যা, যারা আরব নয়, এমন মুসলিমদের উপর আরবদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আনোয়ার শেখ-এর এই তত্ত্ব, এমন অকাট্য যে কোনো মোল্লা এই তত্ত্বকে খণ্ডন করতে এগিয়ে আসেনি। পরিবর্তে তারা ষড়যন্ত্র করে, চুপচাপ থেকে বিষয়টিকে গুরুত্বহীন করে দেবার চেষ্টা করে চলেছে।

আনোয়ার শেখ ইংরেজী ও উর্দু, উভয় ভাষাতেই স্বচ্ছন্দচারী। তিনি বেশ কিছু সংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতা এবং তাঁর বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি বহুমুখী। যদিও তিনি কবি, দার্শনিক এবং বিভিন্ন ধর্মবিষয় নিয়ে চর্চ্চায় আগ্রহী এবং বিদ্বানরূপে পরিচিত, তাঁর অর্থনীতি, কর-বিষয়ক আলোচনা, ইতিহাস, আইন, মনোবিজ্ঞান, কাব্য ও সাহিত্যের উপর আধারিত রচনাগুলি পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত। তাঁর ত্রৈমাসিক পত্রিকা "লিবার্টি" আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন।

লেখক, জীবনে বহু ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন, তিনি স্বচেষ্টায় শিক্ষিত এবং স্বনির্ভর। যখন তিনি জমি, বাড়ী সংক্রান্ত ব্যবসায়ে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আসীন, তখন বিবেকের নির্দেশে তিনি সব কিছু ছেড়ে দিলেন। তিনি হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর পরিচয়, চার বেদ এবং দেশীয় ধর্মগ্রন্থগুলিতে নিহিত আছে এবং যতদিন না তারা তাদের মূলস্রোতে ফিরে যায়, ততদিন তাদের অবস্থা ছিন্নমূল বৃক্ষের মতো থাকবে। আনোয়ার শেখ-এর আন্তরিক অভিমত হল এই যে যদি ভারতীয় উপমহাদেশবাসীরা তাদের বৈদিক পরিচয় গ্রহণ না করে, তবে অতীতে হাজার বছর ধরে তারা যে ক্লেশ অনুভব করে এসেছে, তার থেকে আরো বেশী দুর্দশাগ্রস্ত হবে।

১৯৫৬ সালে আনোয়ার শেখ, গ্রেটবিটেনে অভিবাসন গ্রহণ করেন। এক ওয়েল্‌শ মহিলার সাথে তাঁর বিবাহ হয় এবং তিনি তিনটি সন্তানের জনক।

কারডিফ্
ওয়েল্‌স
সেপ্টেম্বর ১৭; ১৯৯৬